অন্তরঙ্গ

চারু মজুমদার

অগ্রজপ্রতিম —
[illegible] কে
গভীর শ্রদ্ধায়
অমিত ২৭/৯/৯১

অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার

সংকলক

অমিত রায়

র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন

৪৩ বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা ৯

ANTARANGA CHARU MAJUMDAR
—A Biographical Sketch
Compilation : AMIT ROY

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী ১৯৮৯

মুদ্রক ও প্রকাশক :
অরুনকুমার হেঁস
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

আট টাকা

সংকলকের ভূমিকা

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আর এমন একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার নাম করা যাবে না যিনি শত্রুর হাতে বিপ্লবের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন। মুজফ্‌ফর আমেদ নন, ডাঙ্গে, রণদিভে, অজয় ঘোষ, রাজেশ্বর রাও, নাম্বুদ্রিপাদ কেউই নন। চারু মজুমদারই ছিলেন প্রথম শীর্ষস্থানীয় একজন নেতা যিনি কারার ঐ লৌহ-কপাটের অন্তরালেও নয়, খোদ পুলিশ প্রশাসনের হেড কোয়ার্টাসেই প্রাণ দিয়েছেন ২৮শে জুলাই, ১৯৭২-এ। ধরা পড়ার মাত্র এগার দিনের মাথায়। তাঁর মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত। মারা যাবার সময় তাঁর বয়েস হয়েছিল ৫৪ বছর। বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার তাঁর মাথার দাম ধরেছিল প্রত্যেকে ১০ হাজার টাকা করে। কার্ডিয়াক অ্যাজমা নিয়ে প্রায়শই মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হোত—অক্সিজেন সিলিণ্ডার ও পেথিড্রিন ইঞ্জেকশনসহ দুঃসহ আণ্ডার গ্রাউণ্ড জীবন কাটিয়েছেন তিনটি বছর।

সিপিআই (এম-এল) পার্টি গঠনের মাত্র তিন বছরের মধ্যে তাঁর নাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং গত দু'দশক ধরে গোদাবরী, খাম্মাম, ওয়ারাঙ্গাল, পালামৌ, জেহানাবাদ, ভোজপুর, বস্তারে অর্থাৎ ভারতের গ্রামাঞ্চলে তাঁর রাজনীতিকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠছে সশস্ত্র আন্দোলন। তাঁর ৩০ বছরের রাজ-নৈতিক জীবনের শেষভাগে বিপ্লবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রাণ দিয়েছেন ভারতের অসংখ্য তরুণ ছাত্র-যুব-কৃষক ও শ্রমিক। কিরকম ছিলেন সেই মানুষটি? তাঁর জীবনের পরতে পরতে কোন বোধ, চেতনা, আকাঙ্খা ও স্বপ্ন কাজ করেছিল? বর্তমান ব্যবস্থার পক্ষে

কলম চালিয়ে যাদের জীবিকা, তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন 'হিংসার রঘুপতি।' এখনও তাঁর নামকে ঘিরে নিষিদ্ধতার বেড়াজাল। এঁরা চান, যুগ যুগ ধরে হিংসাটা শাসকশ্রেণীরই একচেটিয়া থাকুক।

তাই এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকগুলি অনুসন্ধান করতে বর্তমান এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমাদের সাধ ও সাধ্যের মতে ফারাক অত্যন্ত দুস্তর। টলস্টয়ের কথায়, 'জীবন শিল্পের চেয়ে অনেক মহান'। এতবড় মাপের মানুষ, যিনি একটা ঐতিহাসিক সময়কে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাঁকে সামগ্রিক উপলব্ধি নিয়ে অনুধাবন করতে গেলে যে দক্ষতা ও সময় প্রয়োজন ছিল তার অধিকারী আমরা ছিলাম না। তবে আশা এইটুকু যে, মুক্ত ভারতের যে স্বপ্ন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা দেখেছিলেন তাকে সফল করতে হলে অনেক কাজের মধ্যে চারুবাবুকে উপলব্ধির স্তরকে উন্নত করাটাও একটি কাজ এই বোধ ক্রমশঃ সঞ্চারিত হচ্ছে। আর তাঁকে জানা মানেই তাঁর দুর্দমনীয় স্পিরিট ও প্রাসঙ্গিকতা বোঝা। এই প্রাথমিক প্রয়াসের উদ্দেশ্য হল তাই।

মূলত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা এই সংকলনটিতে আমরা কিছুটা সাহায্য পেয়েছি স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় রচিত ছোট গ্রন্থ 'রূপ-কথার দেশে' থেকে, সুখান জেতি লিখিত 'দুরন্ত' বলে একটি রাজ-নৈতিক উপন্যাস থেকে। যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গৃহবধূ যাঁদের বাড়ীতে চারুবাবু ছিলেন মাসাধিক কাল, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড পিরিয়ডে, বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত রাজনৈতিক সহকর্মীরা, যাঁরা খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন এবং এখন বিভিন্ন অবস্থানে আছেন। সাক্ষাৎকারে তাঁদের স্মৃতিচারণ হুবহু আমরা রাখিনি। তাই তথ্য-জনিত কোন ভুল থাকলে আগামী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। এছাড়া, ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জীবিত রয়েছেন যেমন আবদুর রাউফ, নাগভূষণ পট্টনায়ক, তেজেশ্বর রাও,

শর্মা, সীতারামাইয়া, শরাফ, সত্যমূর্তি, কানু সান্যাল, সুনীতি ঘোষ, অসীম চট্টোপাধ্যায়, মহাদেব মুখার্জী, আজিজুল হক প্রমুখ তাঁদের সাক্ষাৎকার নেবার প্রয়োজন ছিল। স্মৃতিচারণ যাঁরা করবেন তাঁদের অনেকে জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছেছেন, আবার কেউ কেউ আজ আমাদের মধ্যে আর নেই। তাই কঠিন কাজটা ধারাবাহিকভাবে চালাতে হবে। সবচাইতে বড় কথা হল শিলিগুড়ির কালু ডাক্তার, লীলাদি, অনীতা ও অন্যান্যদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানবার আছে। তাই, আশা করছি এই প্রস্তুতি পর্ব সারা হলে পরবর্তী সংস্করণ আরও পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ হবে। আমাদের অনুরোধ' যদি সবার কাছে আমরা পৌঁছতে নাও পারি, তবুও তাঁরা যেন ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে প্রকাশকের ঠিকানায় তাঁদের স্মৃতি-চারণ স্ব-উদ্যোগে পাঠিয়ে দেন।

আমরা এই স্মৃতিগ্রন্থে যা ধরতে চেয়েছি তা হল, সমসময়ে চারুবাবুর ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা। 'রাইফেল হাতে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ একজন দরিদ্র কৃষক',—এই মনে হয় ছিল চারুবাবুর স্বপ্ন যাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'লেট-মোটিভ'। এ স্বপ্ন তাঁর জীবন দিয়ে শেষ হয়নি, শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। অন্ধ্র-প্রদেশের বিখ্যাত গণকবিরা তাঁকে অজস্র কবিতার মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়েছেন আমরা শুনেছি। তর্জমা করে আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা ব্যবহার করব কথা দিচ্ছি। যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়ে, অন্যান্যভাবে সাহায্য করে, অতি দ্রুত কম্পোজ করে, ছাপার ও বিলির কাজে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, শুধু নীরবে উচ্চারণ করব একসঙ্গে বহুদূর পথ চলার দৃঢ় অঙ্গীকার।

বইমেলা, **অমিত রায়**

জানুয়ারী, ১৯৮৯

লেখকের অন্যান্য বই :

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন
ও চীনের ঘটনাবলী (১৯৮১)

লিন পিয়াও—লঙ ইয়েস্টারডে (১৯৮২)

ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কি ও কেন (১৯৮৭)

ঘটনা যখন ঘটে যায়
তখন
আমরা তাকে জানতে পারি ;
কিন্তু
এই ঘটনা ঘটানোর পেছনে
কত দুঃখ,
কত চোখের জল,
কত বীরত্বের কাহিনী
লুকিয়ে আছে
তা আমরা
তখনই জানতে পারি না।

—চারু মজুমদার

মঞ্জুষার কথা

কাল রেডিওতে খবরটা শুনে সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ছটফট করেছি বিছানায়। মামনকে আজ স্কুলেও নিয়ে যাই নি। দেরীতে উঠলাম তাই। সকালে চোখ দুটো কাগজে আটকে গেল। 'কিপ এলারট্। চারু মজুমদার ইজ্ ডেড্। উই মাস্ট বি অন্ দা অফেনসিভ।' অয়ারলেসের মাধ্যমে গোটা পশ্চিমবাংলার থানায় ঘন ঘন মেসেজ ছড়িয়ে যেতে থাকে।

গত দশ এগার দিন ধরে প্রতিটি ওঠা-বসা, চলা ফেরা, কাজেকর্মে রায়মশাই অর্থাৎ চারু মজুমদার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছেন। প্রথম দিন দেখার কথা মনে পড়ে, আমাদের পিসতুতো দাদার বাড়ী, বসন্ত রায় রোড। প্রথমে ভয় ভয় করছিল। হবেই নাই বা কেন? মানুষটির নামের সঙ্গে পরিচয় বেশীদিনের না হলেও অত্যন্ত গভীরে চলে গেছে তাঁর নাম গোটা দেশে। ছোটখাট, পাতলা রোগা, মাঝারি হাইট। বড় বড় সুন্দর চোখ। একদম পদ্মপলাশ লোচন। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা কঠিন। ছোট ছোট চুল। নাকটা ধারাল, ঠোঁট অবধি চলে এসেছে।

কালকেই সব শেষ হয়ে গেছে। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। যে মানুষটা দীর্ঘদিন এত অসুস্থ শরীর নিয়ে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড জীবনের ধকল সয়ে, সারা ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ চষে বেড়িয়েছেন, আজ তিনি সমস্ত রকম সরকারি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েও (?) গ্রেপ্তার হবার মাত্র বারো দিনের মাথায় মারা গেলেন। ওদের এতটুকু সাহস হল না তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে বিচারের প্রহসনটুকু করার।

লীলাদি ওর স্ত্রী, দেখে এসেছেন, তাঁর হাত-পা ছিল ভীষণভাবে ফোলা। কেন এত ভয়? কড়া পুলিশ প্রহরায় মৃতদেহ দাহ করা হল বৈদ্যুতিক চুল্লীতে অতি গোপনে। কোন সাংবাদিক, ক্যামেরা-ম্যানকে পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়নি তাঁর কাছে। পুলিশের কাছে কাদের যেন কঠোর নির্দেশ, কোন প্রশ্ন করা চলবে না। শুধু

সমস্ত মন্ত্রী ও নেতাদের বাড়ীর সামনে গিজ গিজ করছিল পুলিশ আর পুলিশ তাঁর মৃত্যুর পর।

১৭ই জুলাই রাত তিনটেয় যখন ইণ্টালি থানার মিডল রোডের তিনতলা বাড়ির ফ্ল্যাট থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে, তখন থেকেই একমনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি কাকাবাবুর যেন কিছু না হয়। আর রোজ কাগজের পাতায় খুঁজেছি তাঁর কথা। শিয়ালদা-বালীগঞ্জ ট্রেন লাইন সেই বাড়ীটার পেছন দিকের দেয়াল ঘেঁষে চলে গেছে। নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীর চাইতেও নিরিবিলি। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার পক্ষে আদর্শ ছিল নিশ্চয়ই। অত ভোরেও কাকাবাবু জেগে ছিলেন। আচ্ছা, তখন অক্সিজেন সিলিণ্ডার, পেথিডিন ইঞ্জেক্‌শন, সিরিঞ্জ এসব ছিলতো হাতের কাছে? উঃ মনে আছে হাঁপানির টানে কি কষ্টটাই না পেতেন। কার্ডিয়াক অ্যাজমা বাড়াবাড়ি হলে মুখ দিয়ে রক্ত পর্যন্ত পড়ত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা, ওঁর ঘরে হাতে তৈরী ট্রানজিস্টর রেডিওটায় উনি পিকিং রেডিও'র নিউজ শুনছেন। পরে জেনেছি সেদিন খবরে সি-পি-আই (এম-এল) পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে; যে পার্টির সম্পাদক খবরটা শুনছেন বেতারে। কিছুক্ষণ বাদে কাশতে কাশতে উনি বাথরুমের বেসিনের কাছে চলে গেলেন। দৌড়ে গেলাম আমি ও দেবী দুজনেই। রক্তে ভরে গেছে বেসিন। খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। সেদিন ওর জন্য ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। এত শারীরিক কষ্ট নিয়েও মানুষটা কত কঠিন জীবন কাটাচ্ছেন।

কি হয়েছিল ওর যে গ্রেপ্তার হবার মাত্র বারো দিনের মধ্যে তিনি মারা গেলেন? অথচ কয়েকদিন আগে যখন খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—এইসব অভিযোগে ওঁনাকে গ্রেপ্তার করে লালবাজার লকআপের পাশের ঘরে সাংবাদিকদের সামনে আনা হয়, তখন তাকে বেশ প্রফুল্লই লাগছিল। এতটুকু বিচলিত দেখায়নি। কাগজেই ফোটো দেখেছি। একটা শার্ট আর সাদা পাজামা পরে হাসি হাসি মুখে ফটোগ্রাফারদের কিছুটা সময়

দিয়েছেন। হার্ট স্পেশালিস্টও ইসিজি রিপোর্ট দেখে বলেছেন, অসুস্থ, তবে খারাপ আশঙ্কা করার কিছু নেই। তবুও এটা কি করে হল? তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সিদ্ধার্থবাবুর সরকার। একই অঙ্ক ঘোষণা করেছিল অন্ধ্র, বিহার, উড়িষ্যার সরকারও। যেদিন পুলিশ হানা দিয়ে তাঁকে ধরে তারপর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনার ফোনে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবুকে জানান। সিদ্ধার্থবাবু লাইটনিং কলে দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীকে জানান। আকাশবাণীর প্রতিটি কেন্দ্রে খবর ঘোষণা করা হয়। সেই মানুষটা আজ আর নেই। কাগজে দেখলাম, কাকাবাবুকে গ্রেপ্তারের সময় আর দুজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা শ্লোগান দিয়ে কালো ভ্যানের সামনে অত রাতে জমায়েত লোকের সামনে বলে ওঠেন, 'কমরেডস্, আমাদের সঙ্গের এই বয়স্ক মানুষটাই হলেন চারু মজুমদার। পুলিশ এঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।' সমস্ত জনতাই পলকের জন্য থমকে উঠল। নকশালবাড়ীর সুবাদে এই নামের সঙ্গে পরিচিত সবাই। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক রোমান্টিক নেতার চরিত্র। একজন বয়স্কা মহিলা বলে উঠলেন, আহা, এমন একজন মানুষ আমাদের পাড়ায় ছিলেন! আগে জানলে একটু চোখের দেখা দেখে নিতাম।

সেদিনের দৈনিক কাগজ লিখল 'হিংসার রঘুপতিপ্রতিম পুরোহিত চারুবাবু কালীমূর্তিকে ঘোর দংস্ট্রা করাল স্বরূপের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তবে ইহাও লক্ষণীয় যে তাঁহার মতে দীক্ষিতগণ একদা কেবল মনীষিদের প্রতিমূর্তির অঙ্গহানি ঘটাইয়াছে, কিন্তু সার্বজনীন পূজামণ্ডপে বা মন্দিরে দূরে থাক, পথে ঘাটে ব্যাঙের ছাতার মত গজান সিন্দুর ও পাথরের নুড়ি বা গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের কালোপাহাড়ী উৎসাহ আদৌ উত্তেজিত হয় নাই। এসবই আত্মখণ্ডন এবং ভ্রান্ত নির্দেশের পরিণাম ও ফল। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অজস্র কটু কথা, হাফ পলিটিকাল, হাফ অ্যান্টিসোসাল, সি-আই-এ এজেণ্ট, ৬৭ বিঘা জমির মালিক, বাড়ীতে মা-কালীর ছবি

টাঙানো এসব তো রয়েইছে। টিপ্পনিসমেত অপর কিছু লোক আজ ভোট, কাল বিপ্লব এই ফাঁসির মন্ত্র জপিয়া যারা দলীয় কর্মীদের ঠকাইয়াছে তাদের নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের কাকাবাবুর গ্রেপ্তারের পর বক্তব্য—'এসব লোক যতদিন পার্টিতে ছিলেন ততদিন পার্টির নীতির বিরোধিতা করার মত নৈতিক সাহস এদের ছিল না।' জনস্মৃতি অত হ্রস্ব নয়। পত্রিকাটি লিখছে, যুক্তফ্রন্ট আমলে মন্ত্রী হইয়া হরেকৃষ্ণবাবু তবে কাহাকে ভজাইতে নকশালবাড়ী ছুটিয়া যান? দলতো তখনও ভাগ হয়নি?

তো, এই হিংসার রঘুপতিকে আর বাঁচিয়ে রাখা গেল না। কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলাম, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে প্রি-মেডিকেল পড়ে যে বড় মেয়েটি—অনীতা—সে বাবার সাথে লালবাজারে দেখা করতে এসেছে। সতের বছরের মেয়ে বাবাকে দেখল কত দিন বাদে। বাবার গায়ে নীরবে হাত বুলিয়ে পাশে বসল। কাকাবাবু হেসে বললেন, অনীতা, কি খবর, তুমি তো একদম লেডি হয়ে গেছ? তার কদিন বাদেই শিলিগুড়িতে ফিরে সে জানল তার বাবা আর নেই।

আচ্ছা, তখন কত বয়স ছিল কাকাবাবুর? পঞ্চাশ সবে হয়ত পেরিয়েছিল। কিন্তু তখনই তিনি বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করতেন। রোজ রাত্রে দেখতাম ভীষণ যত্ন করে পরিস্কার করে দাঁত তুলে রাখতেন। পুলিশের সংবাদদাতার রিপোর্টে দেখেছিলাম—হানা দেবার পর চারুবাবুকে সাব ইন্সপেক্টর বললেন, আপনার খোলা দাঁতের পাটি দুটো পরুন তো। উনি তাই করলেন। পুলিশটি বেরিয়ে এসে ডেপুটি কমিশনারকে ফোন করে জানালেন, 'স্যার, ঠিক লোককেই পেয়েছি। চলে আসুন।'

স্নেহলতার কথা

চারু যতদিন বাইরে কাটিয়েছে, জেলখানায় কাটিয়েছে তার চেয়ে কিছু কম নয়। সেটা কোন সাল মনে নেই। তবে ৬২/৬৩ হবে হয়তো। জেলে বন্দীদের মধ্যে মুজফ্‌ফর আহমেদও ছিলেন। বিশ ফুট উঁচু পাঁচিলে ঘেরা জেলে ডায়েট, থাকা, শৌচাগার, ওষুধপথ্য নিয়ে কমিউনিস্ট বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। চারুর শরীর তখন একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। ধর্মঘটীদের উপর পুলিশ লাঠিগুলি চালালে আত্মরক্ষার জন্য তারা থালা, গেলাস, জলের কুঁজো, খাটিয়ার ডাণ্ডা এসব দিয়ে প্রতিরোধ করত। অনশনের সময় জেল ওয়ার্ডাররা জোর করে চারুকে খাওয়ানোর চেষ্টায় মুখের দাঁতগুলি অকালে ভেঙে দিয়েছিল। শুনেছি মুজফ্‌ফর আহমেদের মধ্যস্থতায় গুলি-লাঠি চলা বন্ধ হল। কিছুদিন পর কারামুক্ত হয়ে চারু যখন বাড়ী ফিরে এল তখন তার জীর্ণ শরীরে বার্দ্ধক্যের ছাপ। দেখে চোখে জল চেপে রাখা যায় না। কঙ্কালসার চেহারা। খেতে পারত না। হজম শক্তি নিঃশেষ, শরীর হয়েছিল কঞ্চির মত। তবু কঞ্চিগাছা ভেঙ্গে পড়েনি, নোয়ায়নি শোষকের রক্ত চক্ষুর ভয়ে।

চারু ছিল আমাদের বড় কাছের মানুষ। তার মধ্যে কখনও অসাধারণত্ব খুঁজতে চেষ্টা করিনি কিন্তু যখনই সে আমাদের চোখের আড়ালে চলে যেত তখনই সে হয়ে উঠত কিংবদন্তীর নায়ক। তখন সে শিলিগুড়িতে থাকত। তার সম্বন্ধে নানাজনের মুখে নানা বিচিত্র কাহিনী শুনতাম। বনের পথে যেতে যেতে কেউ তাকে গাছের ডালে শুয়ে থাকতে দেখেছে। কেউ হয়ত দেখেছে, অমাবস্যার রাত্রে সাদা থান পরে বিধবা সেজে চারু ধানক্ষেতের আল ধরে বাড়ী এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করেছে। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে, মায়ের কাছে ঘুমিয়ে, ভোর রাতে উঠে আবার গ্রামে চলে গেছে। ইংরেজ রাজত্বে কতই বা বয়স তখন চারুর। এরকম সে প্রায়ই আসত। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরা ওকে দেখে উচ্চবাচ্যও করত না।

কারণ শিলিগুড়ির মানুষ চারুকে খুব ভালবাসত। বাইরে সে এত সহজ ঘরের মানুষ ছিল যে তাকে বিশেষ একজন ভাবার কথা মনেই আসেনি। আমরা অনেকেই বুঝতে পারতাম না সে কেন এইরকম স্বেচ্ছাদারিদ্র বরণ করে গ্রামের কুটীরে কুটীরে ফেরে। আমার কাছে সে ছিল এক অনন্য চরিত্র। শুধু একটা সূক্ষ্ম বেদনা মনে খচ্ খচ্ করত। সে কোথায় আছে, কি করছে, খেতে পাচ্ছে কিনা দুমুঠো ভাত। পৌষ সংক্রান্তির দিন বাড়ীতে চিতোই পিঠে, পাটিসাপটা, মুগের পুলি, বকুল পিঠে রসবড়া করেছি। ভাবছি চারু যদি আজ আসত তাহলে কি ভালোই না হত। ভাবতে ভাবতেই দেখলাম এসে হাজির চারু। তার সেই একই মলিন বেশে হাসি হাসি মুখ। এক থালা পিঠে পুলি দিতে দিতে বললাম—তোর কথা ভাবছি আর অমনি এসে হাজির হলি? তুই কি হাত গুণতে জানিস? আমার কথার একটাও জবাব না দিয়ে সে একমনে খাবার খেত। প্লেটটা খালি করে আবার বলত—যদি বেশী থাকে তো দাও। প্লেট খালি করে আবার বলত, দাও। তার চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সে যেমন দিনের পর দিন না খেয়ে কাটাতে পারত, তেমনি আবার খাবার জুটলে ভীমের মত খেত। সবাই হাসাহাসি করলেও এতটুকু অপ্রস্তুত হত না চারু। আমার মেয়ে বলত—চারু মামা তোমার কি দোতলা পেট, খেয়ে উঠে আবার খাও কি করে। চারু ইয়ার্কি মেরে জবাব দিত, 'আরে, খাবার পেলে কখনও ছাড়তে নেই। যখনই পাবি খেয়ে নিবি। খাবার সুযোগ ছাড়াটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' এসব কবেকার কথা, ১৯৪৭ এরও আগের। বহুদিনের সেসব স্মৃতি হাসির নয়, অশ্রু ছলছল সেসব বেদনাময় ভাবনা। সেই খাওয়া নিয়ে ঠাট্টাতামাসার মধ্যে সে আমাকে একটা গল্প বলেছিল। সে গল্পটা ভারী করুণ। তার পার্টি জীবনের যে বড় অধ্যায়টা আমার কাছে অজানা ছিল, সেই অধ্যায়ের একটা টুকরো সেদিন প্রকাশ করেছিল।

ব্রিটিশ রাজত্বে সিকিমের রাজারা মাত্র ছ-হাজার টাকায় দার্জি-

লিংকে বিক্রী করে। তরাই অঞ্চল তারই সমতলভাগ। ডুয়ার্স থেকে তিস্তা নদী ভাগ করেছে তরাইকে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তরাই-এর সীমানা। জঙ্গল কেটে ব্রিটিশরা বসিয়েছিল চা বাগান। রাঁচী, ছোটনাগপুর, মানভূম, বিহার, মেদিনীপুরের সাঁওতাল, ওঁরাও মুণ্ডা, নাগাসিয়া এই সব আদিবাসীদের নিয়ে আসা হল দলে দলে জঙ্গল সাফ করার জন্য। আর ওপরের দার্জিলিং থেকে নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা। যেসব জায়গায় চা চাষ হত না সেখানকার পত্তনি পেয়েছিল রাজবংশীরা। এরা বছরের বেশির ভাগটাই ভাত খেতে পেত না। শাকপাতা কচু-ঘেচু খেয়েই চাষের কাজে খাটত। এই সব রাজবংশী কৃষকরা মাটির সঙ্গে এমন টানে জড়িয়ে থাকত, যে উপোস করে মরলেও ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও যেত না। চারু আর তারই মত শহরের বাবুদের ঘরের আরেকজন ছেলে, পার্টি করত মাটি-দেওয়া, নলবাড়ি ধানিবাড়ি এসব জায়গায়। একদিন আকালের সময় কৃষকরা চারু আর তার কমরেডকে নেমন্তন্ন করেছে ভাত খাবার। বেশ কয়েকদিন তারা আধপেটা খেয়েছিল। ভাতের হাঁড়ি যেখানে মাটি খুঁড়ে উনুনের উপর বসান হয়েছে সেখানে গিয়ে ওরা পৌঁছুল। বাতাসে নুনিয়া ধানের চালের গন্ধ। ওরা কজন অভিভূত নয়নে তাকিয়ে আছে পাটকাঠির আগুনের দিকে, মাটির হাঁড়ির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি ন্যাংটো, তালিদেওয়া ইজের পরা চাষীর ছেলে ভাতের গন্ধে হাজির। ওরাও সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে ভাতের দিকে। যার বাড়ীতে ওরা গিয়েছিল, যতীন, সে ছেলেগুলোকে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া করল, যা ভাগ, চ্যাংড়া, কম চাল বসিয়েছি বাবুদের জন্য। তোরা খেলে কি কুলোবে? যা যা পালা, আরেকদিন ভাত খাবি। তবুও বাচ্চারা যায় না।

চারুর মোহভাব কেটে গেল। সব কথা শুনল, বুঝল। হাঁড়ির কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল সামান্য চালের ভাত। যারা নিজেরা না খেয়ে, সন্তানদের মুখে দুটো ভাত না তুলে দিয়ে পার্টির কমরেডদের বাঁচাতে চায় তাদের অব্যক্ত ভালোবাসা চারুকে করল অধীর। চারু

যতীনকে বলল, তোদের চ্যাংড়াদের মুখের ভাত আমাদের খাওয়াতে চাস্, আমরা কি তা খেতে পারি? বলেই দৌড় ওরা দুজনে, যাতে যতীন ও তার শাগরেদরা ভাত খাবার জন্য পীড়াপীড়ি না করতে পারে। চারু আমায় পরে বসেছিল, ওদের নাগালের বাইরে পালিয়ে এসে রক্ষা পেলাম। তা নইলে আর খিদে সামলে থাকতে পারলাম না। এই হল চারু। শুধু এক চারুর মাধ্যমেই আমি লক্ষ কোটি আদর্শবাদী বিপ্লবীর স্বভাব ও রূপের আভাস ফোটাতে চাইছি। তিলক, লাজপত রায়, নেতাজী, দেশবন্ধু এঁরা সবাই এক মহাসমুদ্র হয়ে ওর মধ্যে মিলেছিল। এ দেশে জন্মে সে দেশের মাটি ও বাতাসকে পবিত্র করে গেছে।

নয়টি সন্তান হারিয়ে হারাণী মাসিমা, একটি মাত্র সন্তান চারুকে নিয়ে সুখের আশা করেছিলেন। কিন্তু কতটুকু সময় তিনি চারুকে কাছে পেতেন, গৃহছাড়া পুত্রের চিন্তায় তাঁর দিনগুলো কেমন শূন্যতায় কাটতো তা বোঝানোর সাধ্য আমার নেই। তাঁর গভীরতম অন্তরের ব্যাথা-বেদনা কখনো মুখে প্রকাশ করেন নি। গোটা জীবন তিনি হাসিমুখে সব দুঃখ অভাব সহ্য করেছেন। আমি তাঁর স্বর্ণআভরণহীন দুখানি হাতে শঙ্খআভরণেই রাজেন্দ্রাণীর শোভা দেখেছি। লালপাড় শাড়ী আর সাদা মার্কিন সেমিজ ছাড়া আর কোন দামী পোশাক তার পরণে কোনদিন দেখিনি। এত আশ্চর্য শান্ত, সহনশীলা, আদর্শ মহিলা আজকালকার দিনে কমই দেখতে পাওয়া যায়। অন্নবস্ত্রের অভাব সংসারে যথেষ্ট থাকলেও, শান্তির অভাব ছিল না। খুবই অল্পে সন্তুষ্ট তাঁরা, অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত মনোমালিন্য কোনদিন দেখিনি। পরণে একটা মোটা ধুতি ও একটা মোটা খদ্দরের বেনিয়ান গায়ে মেসোমশাইয়ের এই চেহারা আজও আমার চোখে ভাসে। তাঁদের ছেলে চারু পোশাক-আশাকের দৈন্যতায় তাঁদেরও ছাড়িয়ে গেছে। ঘরে কাচা একটা হাফপ্যান্ট ও একটি সস্তা ছিটের শার্ট—এক জামা পড়ে আমি তাকে চিরকাল কাটাতে দেখেছি। বস্তি থেকে চারু হঠাৎ কখনও শিলিগুড়িতে আমাদের বাড়ীতে এলে ওর ময়লা

জামা-প্যান্ট পরা মূর্তিটা এখনও মনে পড়ে। সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল কাঁধে একটা ঝোলা। ভাবতাম তার নিজের দরকারী জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সম্বল নিয়ে সে সব জায়গায় ঘোরে। তাই তার চিরপথিক জীবনে ঝোলাটাকে দেহের একটা অঙ্গ বলে জানতাম। পরে জেনেছি সে ধারণা ভুল। তার ঝোলাতে বেশীর ভাগ থাকত বই, বাংলা ও ইংরাজী। তার অশেষ জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল বইগুলি। পথে ঘাটে, বনে, জঙ্গলে, গাছের তলায়, কৃষকের ঘরের দাওয়ায়, বইগুলিই ছিল অমৃত পাথেয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বইগুলি জোগাড় করে নিয়ে ঝোলাতে পুরত। গোগ্রাসে শেষ করে আবার নতুন বই নিয়ে আসত। ভালো খাবার খেতে চারু খুব ভালবাসত। কিন্তু একদিন পেট পুরে খেল তো পরদিন উপোস।

১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের সময় মেসোমশায় বীরেশ্বর শিলিগুড়িতে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন তিনি। দেশ তখন উত্তাল। বাবার সঙ্গে সামিল হয়ে চারুও জেলে গেল। বাপ-বেটা তুজনেই জেলে। তাই দেশপ্রেমের প্রেরণা চারু প্রথম পায় তার বাবার কাছ থেকে। সে সময় শিলিগুড়ির সবাই জানে মাত্র তের-চোদ্দ বছরের চারু, রাজনৈতিক চিন্তায় বেশ পরিণত। ১৯২০-২১ সাল থেকেই পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়ামের আখড়া, পৃথিবীর দিকে দিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, নাটক, গান, কাব্য ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের দিকেও। ইংরেজ সরকারের দমনপীড়ন, লাঠিগুলি, ফাঁসির মঞ্চ, এসব সত্বেও যে তরুণ যুবকেরা হাসতে হাসতে এগিয়ে গেছে, চারুর সামনে তাঁরাই দৃষ্টান্ত হয়ে গেল।

সৌরেনের কথা

আমাদের ছোট শহর শিলিগুড়ির কাছাকাছি বনাঞ্চল ছিল বড়ই রহস্যময়। সেই অরণ্যের অনুপম সৌন্দর্যের পাশাপাশি ছিল ঘন জমাট অন্ধকারের ভয়। কাজের তাগিদে মানুষ দিনের বেলা জঙ্গলের পথে যাতায়াত করত। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এলে সে পথে পা মাড়াতে কেউ সাহস করত না। স্নেহদির কাছে শুনেছি লোকে বলত, ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়, পাত পড়লে কুলো—এমনি ঘন সেই বন। সেই অন্ধকার বিজন বনে বিরাট লম্বা লম্বা শাল গাছেরা ঘেঁষাঘেষি দাঁড়িয়ে আকাশে মাথা তুলতো। বনের কাছাকাছি গ্রাম ও বস্তির মানুষরা প্রায় সবাই গরীব। ভাষা ও জীবন আলাদা হলেও দারিদ্র ছিল একরকম। রাজবংশীরা চাষবাস করত। অন্য কোন পেশায় তারা যায়নি। সাঁওতালী ও নেপালী আদিবাসীরা চাষ ছাড়াও কুলিগিরি করত, চা বাগানে মজুরী করত। দু-টাকা মজুরীতে সারাদিন বাগানের কাজ, অবসরে নায়েব সাহেবদের কাজ। শাল-সেগুনের বনভূমির পাশাপাশি জটাজোড়া, কামতাগুড়ি, দিনগাড়াহাট, নলবাড়ী-জোত, বড় শহরগুলি জেগে থাকে গঞ্জ হয়ে, মহকুমা হয়ে, শোষণের প্রাণকেন্দ্র হয়ে। জমিদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার আর বেনিয়ারা ভীড় জমায়। অন্যদিকে ভুখাদের তরাই। শীতকালে মাটি কাঁপিয়ে শীত আসে, বস্তি আর জোতের ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা হিড়হিড় করে শীতে কাঁপে। মাস ছয়েকের পচা বর্ষা, বস্তি আর চালা বাড়ীর চাল ভেদ করে ভাসিয়ে দেয়, রিংরা নদীতে ঢল নামে। মনে আছে ছোট বয়সে যতীনদা সিলেটি সুরে দোতারা বাজাতে বাজাতে মাচার উপর বসে গান বাঁধত—

বল আর কতকাল, আর কতকাল
সহিব এ মৃত্যু অপমান
শহরে বন্দরে চাষীর কুটীরে
অসুরের অত্যাচার।

তবে ছোট বয়সে বুঝিনি মালিক জোতদারদের হাতে এইসব

দীনদরিদ্র মানুষ কিভাবে শোষিত হচ্ছে। কিন্তু ওদিকে টাউনে কোন আন্দোলন হলেই ছোট বয়সেই ঝাঁপিয়ে পড়ি। একবার শিলিগুড়িতে চালের আকাল। আমার দাদার নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠল এটাকে কেন্দ্র করে। আর তখন যে কোন সংগ্রামী কাজের ধরণই ছিল বেআইনী ধাঁচের। এটা হয়ত ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী ওদেরই প্রেরণায়। পাড়ায় পাড়ায় তখন ব্যায়ামের আখড়া, নাটকের দল। মহানন্দ পাড়ায় আমাদের বাড়ী। চারুদাদের বাড়ীর সামনে একটা ক্লাবে আমরা জিমন্যাস্টিক করতাম, ব্যায়াম করতাম। পুরোন কাঠের একতলা বাড়ী ছিল ওদের। আর বাড়ীতে অনেক কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল পাকলে, মনে আছে, আমরা পিসীমার কাছে ধর্না দিতাম, কাঁঠাল খাবো। চারুদার বড় ভাই শুনেছি আগেই জলে ডুবে মারা গেছে। ওদের বাড়ীর আবহাওয়াটা ছিল কেমন লুজ, অ্যানার্কিক। কে কখন আসছে যাচ্ছে খাচ্ছে থাকছে কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আমরা তখন দাদার প্রভাবে বেশ এগিয়ে থাকা, প্রোগ্রেসিভ যাকে বলে। ক্লাস টেনেই রোমঁ্যা রোলাঁর 'জঁ্যা ক্রিস্তফ' পড়ে ফেলেছি। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল, তাও পড়ে ফেলেছি। অন্যদিকে বিবেকানন্দও আমাদের বেশ প্রভাবান্বিত করেছিল। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা তখন আমাদের কণ্ঠস্থ। অন্যদিকে মূল্যবোধগুলো ছিল অত্যন্ত তীব্র। কেউ অসুস্থ, নাওয়া নেই খাওয়া নেই সেবা করছি। কেউ মারা গেছে, মড়া পোড়াতে শ্মশানে চল্। মাস্টার মশাইদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। হেডমাস্টারের কাছে চারুদার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। উনি বলতেন চারুটা একটা অদ্ভুত ছেলে। ক্লাসে ওর ফার্স্ট হবার কথা কিন্তু কোনদিন স্ট্যাণ্ড করত না। একবার অঙ্ক পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের উত্তর দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। এটা ওর ক্লাসের বন্ধুরা গল্প করত। পরীক্ষার আগে হয়ত বন্ধুদের বলত, এই তোরা বইটা পড়ে শোনা তো। তিনবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যেত। অথচ আই. এস. সি. ফাইনাল পরীক্ষাও নাকি দেয়নি। আর

বিড়ি খেত ছোটবেলা থেকে। যে গল্পটা আমরা শুনেছি, ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে হস্টেলে খবর রটে গেল কিছু ছেলে বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে। শিলিগুড়ির বড়লোকের ছেলেরা কালিংটন সিগারেট কিনে ঘরে রাখত। হেডস্যার আচমকা ঘরে হানা দিয়ে ধরলেন সবাইকে। চারুদা বললেন, স্যার আমি যে ক্লাস থ্রি থেকেই বিড়ি খাই। আপনার আদেশ আমার পক্ষে মানা সম্ভব নয় এতদিনের অভ্যেস। চারুদা ছিল নিষিদ্ধ কাজ করার লোক। ছোটবেলা থেকেই যেটা মনে হয়েছে আঘাত করা দরকার ভাঙ্গা দরকার তা সে করবেই। স্কুল জীবন থেকেই এটা শুরু।

স্নেহলতার কথা

১৯৩৬ সালে চারু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় টেস্টে ফার্স্ট হল। মাস্টার মশাইরা আশা করলেন, চারু স্কলারশীপ পাবেই। চারুকে উপলক্ষ করে তাঁরা স্বপ্নও দেখছিলেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের সম্মান নামডাক অনেক ছড়াবে। অন্যদিকে, এই কারণেই তারা নজর রাখছিলেন চারু ঠিকমত পড়াশুনো করে কিনা। এমনকি মাঝে মাঝে বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা হেডস্যার এবং আরেকজন মাস্টারমশাই চারুর বাড়ীতে এসে দেখা পেলেন না। টেস্ট পরীক্ষা বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে, ফাইনাল প্রায় সামনে—এই সময়ে সন্ধ্যেবেলা ছাত্র বাড়ীতে নেই দেখে দুজনেই ক্ষুব্ধ, রাগত। চারুর সঙ্গী দুজন তার মত না হলেও বেশ ভাল ছেলে। শিক্ষকদের এত স্নেহসজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় আড্ডা দিতে গেছে কে জানে? ইংরেজ আমলে শিক্ষকরা তো এখনকার মত ছিলেন না। ছাত্রদের গৌরবে তাঁদেরও বুক ফুলে যেত। মাস্টারমশাইরা আরেকজন ছাত্রের বাড়ীর বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা। ক্রমশঃ ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল। এরপর তিন মূর্তির আগমন হল। হেডস্যারের অবস্থা হল ঘিয়ে

আগুন লাগার মত। ওদিকে ওরা যাত্রা দেখে সেটারই গান ভাঁজতে ভাঁজতে সেখানে উপস্থিত। মনে বেজায় ফুর্তি। হেডস্যারকে দেখে গান থেমে গেল। ভূত দেখার মত চমকে গেল ওরা। হেডস্যার বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত ধমক শুরু করলেন। চারু ও তার সঙ্গীরা স্পিকটি নট্। মাথা নীচু করে একটা কথাও বলল না। ওদের অপ্রস্তুত ভাব দেখে হেডস্যার অগত্যা গলার স্বর নামালেন—টেস্ট পরীক্ষার পর এমন ঘুরে বেড়াচ্ছিস তোদের সাহস তো কম নয়। আর কটা দিন ধৈর্য ধরে পড়তে পারছিস না? একটু মন দিয়ে পড়লে তোরা কত ভালো নম্বর পাবি। থিয়েটার যাত্রা দেখার কি এই সময়?

হেডস্যারের কথায় বাকী দুজন একেবারে চুপ। চারু একটু কেশে নিয়ে স্পষ্ট জবাব দিল—স্যার, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু আমার সব পড়াই মুখস্থ হয়ে গেছে। আর পড়ার দরকার নেই তাই আমার বইপত্র সব একটা গরীব বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছি। হেড-স্যার অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিলেন, একথা শুনে আবার তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন, আমাকে উদ্ধার করেছ। তোর এই বুদ্ধি, আর আমি তোর উপর আশা করে বসে আছি। তুই স্কলারশিপ পাবি, শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের গৌরব বাড়বে। বইগুলো তুই দান করেছিস কি বলে? আর পরীক্ষার কদিন বাকি? এখনও সময় আছে। একটু চেষ্টা করলে স্কলারশিপ তোর বাঁধা। সেই চেষ্টাই করনা বাবা।

চারুর নির্লিপ্ত জবাব—আমার স্কলারশিপ পাবার কোন ইচ্ছা নেই স্যার, তাই আপনাদের আশা পূর্ণ না করতে পারার জন্য সত্যিই দুঃখ পাচ্ছি। তবে কথা দিতে পারি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবই। মাস্টারমশাইরা বিস্ময়ে হতবাক। একি বলছে চারু? হেডস্যার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন—তুমি স্কলারশিপ চাও না, তা বেশ, তাহলে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবার দরকারই বা কি? চারুর সাফ জবাব—ঐটুকু না পড়লে আমার বাবা ও আপনারা দুঃখিত হতেন, তাই পড়েছি।

—ও, শুধু আমাদের জন্যই পড়ছ?, তোমার নিজের কোন উচ্চাশা নেই?

—আছে স্যার, তবে এইরকম পড়া আমার ভাল লাগে না। এ শিক্ষা অসার, বেশী শিখে লাভ নেই।

হেডস্যার কিছুক্ষণ থতমত খেয়ে বোবা হয়ে রইলেন। মাস্টার-মশাইদের ক্ষোভ অসঙ্গত নয় একথা চারু বুঝেও কিছু বলতে পারছিল না। তিক্ত স্বরে মাস্টারমশাই চারুকে বললেন—যা ভালো বোঝো কর, কিন্তু পরিণামে দুঃখ পাবে একথা বলে যাচ্ছি। বিদায় নেবার সময় মাস্টারমশাইরা নিশ্চয়ই ভাবলেন, বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হোক, এ ছেলের মাথার ঠিক নেই। নইলে পরীক্ষার আগে কেউ বইটই দিয়ে দেয়?

পরে চারু আমায় বলেছিল—সেদিন ওকে কথায় পেয়েছিল—তাই একটু কাব্য করেই বলেছিল, এত ছোট সার্থকতায় আমার মন ভরবার নয়। সামনে সোনার পাহাড়, হীরের বাগান, যশের মুকুট দেখতে পেয়ে সেখানে থেমে যাবার জন্য আমি জন্মাই নি। এ সমস্ত পার্থিব ধনের লোভ এড়িয়ে আমি আরো সুন্দর দিগন্তের পানে চলে যাবো। শুধু নিজের সুখ ও আরামের জন্য আমার তপস্যা নয়। মানব জাতির শান্তির স্বর্গ এই পৃথিবীকে গড়তে চাই। জীবনের সুখ সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তো, সিংহাসনে নেই। স্বর্গ-লোকের ইসারা পাই সোনালি ধানের গুচ্ছে। সেই অমৃতের অধিকার নিরন্ন, বঞ্চিত সব মানুষের হাতে তুলে দেব এই আমার স্বপ্ন ও সাধনা। সে সাধনার শেষ হল চারুর আত্মদানে। মানুষের মুক্তির মন্দিরের সোপানতলে।

অবশ্য ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে তার কথা রেখেছিল চারু। এরপর চারু পাবনার এডোয়ার্ড কলেজে ভর্তি হয়। তার উজ্জ্বল স্মৃতিশক্তি আর আশ্চর্য্য মেধার কথা ছাত্র ও শিক্ষকদের মুখে মুখে ঘুরত। আমাদের পাড়ার আরও দু-তিনটি ছেলে ঐ কলেজে তখন পড়ত। ওদের কাছেই শুনেছি এসব কথা। আই. এস. সি. ক্লাসের

ছাত্র হয়েও সে নাকি বি. এস. সি. ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতো। এমন অনেক কৃতি ছেলে ছিল, যারা পড়ায় আটকে গিয়ে চারুর কাছে সাহায্য চাইত। চারুর চেষ্টায় তারা পাশও করে গেছে ভালোভাবে। অথচ নিজের বেলা কলেজে শ্রেষ্ঠ স্থান নেবার কোন আগ্রহই তার ছিল না। এমনকি আই. এস. সি. ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়ে কলেজ ছেড়ে দিল। চারু তখন পূর্ণ যুবক, পরাধীন দেশের মানুষের দুঃখ কষ্ট, তরাইয়ের মাটি দেওয়া ধানিবাড়ী নলবাড়ীর মানুষের যন্ত্রণা ও তীব্র দৈনন্দিন জীবনের সংকট তার সংবেদনশীল মনে দিয়েছিল গভীর নাড়া। তাই পাশ না করে, পড়া কম্‌প্লিট না করেই কৃষক সংগঠন করতে কামতাগুড়িতে ফিরে এল চারু।

সৌরেনের কথা

চারুদা যেবার ম্যাট্রিক পাশ করল আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। ছোট বয়স থেকেই দাদাদের প্রভাবে রাজনীতির ছোঁয়া পাই। আর শিলিগুড়িতে ছোট থেকেই দেখেছি যে কোন আন্দোলন হলেই তার প্রকৃত হত বেআইনী ধাঁচের। হয়ত ধানচালের সংকট, শুরু হল আন্দোলন। আন্দামানে নির্বাসিত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন। আমরা সামিল। লাল ফৌজ ফ্যাসিস্ট দস্যুদের হারিয়ে দেবার খবর পেলে আমরা আনন্দে বিহ্বল। সে সময় চারুদা জলপাইগুড়ি থেকে মাঝে মাঝে বাড়ী আসত। ধবধবে ফর্সা, মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। পাড়ার লোকেরা বিস্ময় আর ত্রস্ত চোখে দেখত বড় বড় লালচে চোখ নিয়ে চারুদা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে নিজের মনে কথা বলছে। কৈশোরের সেই সময় চারুদাকে রহস্যময় মনে হত। পাড়ার লোকেরা বলত নির্ঘাত ও গাঁজা খায় তা না হলে চোখ লালচে হবে কেন? চারুদাদের বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা দেখতাম কাঠের ঘরে হারিকেন জ্বলছে। আর তার আলোআঁধারীতে ৪-৫ জন বসে

গুজগুজ করছে। যেন গভীর কোন আলোচনায় মগ্ন, তার মধ্যে হয়ত একজন মেয়েও আছে। চারুদা তখন আমাদের ক্যাণ্টারবেরির ডিনের লেখা, সোস্যালিস্ট সিক্সথ্ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পড়াত। চারুদার ঝোলাতে তখন অনেকরকম বই থাকত। চারুদা কিছু পার্টির বইপত্রও বিক্রী করত। চারুদার বাবা বীরেশ্বরবাবু চারুদার কাছে বই নিয়ে গোগ্রাসে পড়তেন। বেনারস থেকে ল'পাশ করেও তিনি ওকালতি করেন নি। পুরোদস্তুর গান্ধীবাদী ছিলেন। লোকে তাকে সম্মানও করত খুব। শ্বশুরের জমিজমা শুনেছিলাম নেন নি। চারুদার বাবার সঙ্গে চারুদার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত যা আমরা তখনকার ছেলেরা ভাবতেও পারতাম না। তর্কও করতেন তাঁরা বন্ধুর মত। রাজনীতির দিক দিয়ে দুজন ছিলেন দুই মেরুর লোক। একজন উঠতি কমিউনিস্ট আরেকজন প্রবীন গান্ধীবাদী। আমাদের কাছে ওদের বন্ধুত্বপূর্ণ তর্ক আর চারুদা ছিল অসম্ভব তার্কিক, ভীষণ মুগ্ধ করত। সেই ২২-২৪ বছরের চারুদা বেমালুম গান্ধীজীর ভুয়ো দর্শন বোঝাচ্ছে তার বাবাকে। আর মেসোমশাই বলতেন, 'তোরা বিদেশী আদর্শ আমদানী করছিস।' চারুদা বোঝাত, তোমরা সরকারী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এসব কথা বলছ। আদর্শ কখন নির্দিষ্ট একটা দেশের নয়। তোমাদের গান্ধীও যদি সর্বহারার মতাদর্শ বলত তা হলে সেটাও হত পৃথিবীর সব দেশেরই।

স্নেহলতার কথা

কংগ্রেস ছাড়ার পর মেসোমশাই আর কোন পার্টিতে যোগ দেন নি। কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে মেম্বার করার জন্য অনেকবার অনুরোধ করেছিল। তিনি বলেছিলেন, আমি আর কোন গণ্ডীতে আবদ্ধ হব না; হলে হয়ত আমার সত্যিকথা বলার স্বাধীনতা হারাব। অনেক মানুষকে এক করেই দল হয়। কোন দল চিরদিন বিশুদ্ধ থাকবে, তার মধ্যে পাপ ঢুকবে না, তা হয় না। তোমরা

যতক্ষণ ভালো আছ, আমি তোমাদের সমর্থন করব। দোষ করলে নিন্দা করব স্বাধীনভাবে।

মেসোমশাই অনেকদিন বেঁচেছিলেন, দুঃখ-কষ্ট অনেক পেয়েছেন। চারু বারবার জেলে গেছে। মাঝরাতে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত। রাতে সে খবর মেসোমশাইকে দেওয়া হত না। ভোরে উঠে তিনি জানতেন। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন—'এরাও দেখি ইংরেজ আমলের মত মাঝরাতেই ঘুম ভাঙিয়ে গ্রেফতার করে। তাহলে সেদিনের নিয়ম-কানুন কিছুই বদলায় নি তো।' ছেলের প্রতীক্ষা এ জীবনে মেসোমশায়ের সফল হল না। আশার পথ দেখতে দেখতে ১৯৬৩ সালে নিউমোনিয়ায় ভুগে ৬৯ বছরে তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর ২/৩ দিন আগে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে চারুর মুক্তির জন্য দরখাস্ত করা হল। পিতার অন্তিম অবস্থার কথা জানিয়েও কোন সুরাহা হল না। মুমূর্ষু শ্বশুরের জন্য পুত্রবধূ লীলার ভাবনা, একমাত্র পুত্র না এলে মুখাগ্নি কে করবে? মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে লীলাকে কাছে ডেকে তিনি বললেন—চারুকে তো ওরা জেল থেকে ছাড়ল না, আমারও আর বেশী সময় নেই। তাই বলে যাই, যদি চারু না এসে পৌঁছোয়, তাহলে নাতনী অনিতাই যেন মুখাগ্নি করে।

রাত এগারোটার সময় মেসোমশাই মারা গেলেন। চারুকে যদি জেল থেকে সকালের প্লেনে পাঠায় এই আশায় মৃতদেহ সৎকার হল না। সকালে প্রতিবেশীরা সবাই এবং কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুদলেরই লোকজন এসে হাজির। সবাই চিন্তা করছে, কি করা যায়। মেসো-মশাইয়ের দেহের তখন রাইগার মর্টিস শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ খবর এল সকাল ৮-টার প্লেনে চারু এসে পৌঁছেছে। খানিক পরেই দেখি বাড়ির চারিদিকে পুলিশের লাল পাগড়ী। ওরা বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। সদর দরজায় বন্দুকধারী পুলিশ খাড়া হয়েছে। তারই মধ্য দিয়ে গোয়েন্দা পরিবৃত চারু বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ালো। ছোট বোন বেলার কান্না শুনে বুঝতে পারল বাবা বেঁচে নেই। বাবা এবং প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর ব্যথা যতই বুকে বাজুক কাঁদবার সময় নেই চারুর। অতিকষ্টে

চোখের জল সামলাল। কিছুক্ষণ পরে পুলিস ও গোয়েন্দা পরিবৃত হয়ে মুখাগ্নি করতে চলল। তাদের কাঠের বাড়িটি শূন্য করে চিরদিনের মতো চলে গেলেন আদর্শনিষ্ঠ, সৎ, নির্লোভ,স্নেহশীল বাবা আর তাঁকে কাঁধে তুলে শ্মশানে নিয়ে চলল দলমত নির্বিশেষে অগণিত মানুষ।

এরপর ১০/১২ দিন চারু তার পুরোন কাঠের ঘরে পুলিশ পাহারায় বন্ধ থাকল। আমি সেই সময় ওদের বাড়ী যাওয়া-আসা করতাম। সেই দশদিন পার্টির লোকেরা তার কাছে ঘন ঘন যেত, আলোচনা করত। একদিন আমি সেই ঘরে আছি, পার্টির নেতারা চারুর কাছে এসেছে। বাই-ইলেকশনে তারা চারুকে মনোনীত করেছে। পার্টির দৃঢ় বিশ্বাস, বিপুল ভোটে চারু জিতবে। তবে চারুকে কয়েকটা শর্ত মানতে হবে। শর্তগুলি কি তা পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। তবে ওদের কথাবার্তায় এটুকু পরিষ্কার হয়েছিল যে, সরকারের সমালোচনা মুখে যত কিছু করলেও কার্যতঃ তাদের নীতির বিরোধিতা হয় এমন কিছু সে করতে পারবে না, একমাত্র তাহলেই তাকে প্রার্থীপদ দেওয়া হবে। একথা চারুকে লিখে প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী করান গেল না। পার্টির নেতারা অনেক বোঝাল, চারুর সেই একই কথা। দেশের লোকের উপকার না করতে পারলে ইলেকশনে জিতে কি লাভ? বন্ধুরা বলল, 'তুমি যদি শর্তে রাজী না থাক তাহলে তোমার যে হার হবে তাই নয়, তোমার জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।' তারা উদ্বিগ্ন, চারু নিরুদ্বিগ্ন। এই সেই চারু, রুগ্ন, দুর্বল, ক্ষীণকায়; যে অবহেলায় স্কলারশিপকে দূরে ঠেলে দিতে পারে, নির্বাচনে জেতার সুযোগ পেয়েও কোন আপোষ মানতে চায় না। সেদিনকার আমাদের সাধারণ চারু, ওদের মত লোকের সামনে যেন আরও অসাধারণ হয়ে আমার কাছে দেখা দিল। বাইরের জগতের বিজয়-মালাকে তুচ্ছ করে সে আবার জেলখানাতেই ফিরে গেল। এই হল আমাদের চারু।

সৌরেনের কথা

চারুদা কোনদিন আপোষ মেনে কাজ করেছেন বলে শুনিনি। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ১৯৪৩ সালে কৃষক আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। রাজ্য কমিটি তাঁকে বাংলার কৃষক সমিতির সম্পাদক মনোনীত করে কলকাতা অফিসে বসবার নির্দেশ দিল। চারুদা সে পদ নেননি। চারুদা বলেছিলেন, ঐ পোষ্টের জন্য আরও লোক আছে। কৃষকদের থেকে দূরে গিয়ে কৃষক আন্দোলন করার মধ্যে আমি নেই।

তারপর রাজ্য কমিটি তাঁকে বিডি রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নে কাজ করতে বলে। কৃষক সংগঠনের সঙ্গে যোগ রেখেই চারুদা মজদুর ইউনিয়নের কাজে যোগ দেন। এক বছরের মধ্যে বিডি রেলওয়ের এমন জঙ্গী ইউনিয়ন গড়ে ওঠে যে রেল কর্তৃপক্ষ রীতিমত চিন্তিত হয়। একবার একটা লাগাতার স্ট্রাইক হয়, শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙ্গার আপ্রাণ চেষ্টা করে মালিকরা ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মীমাংসায় আসতে বাধ্য হয়। রাজ্য কমিটি সে সময় স্ট্রাইক তুলে নিতে বলে, কারণ স্ট্রাইকের সাফল্যে তাদের সন্দেহ ছিল। চারুদা কিন্তু নেতৃত্ব দিয়ে মাঝপথে থেমে থাকেন নি। শ্রমিকরা তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে, অনেক দুঃখবরণ করেছে। হেরে গেলে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। কর্তৃপক্ষ তাদের পিষে মারবে। চারুদা তাই রাজ্য কমিটির নির্দেশ লঙ্ঘন করেই স্ট্রাইক চালিয়ে গেছেন এবং শ্রমিকদের জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৫৫ সালে চারুদা তখন চা মজদুরদের মধ্যে আন্দোলন করছেন। স্ট্রাইক ডাকা হল। আড়াই লাখ মজদুরদের স্ট্রাইক গোটা জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং এলাকা জুড়ে। একমাস পরেও মালিকেরা আলোচনার টেবিলে বসতে রাজী নয়। রাজ্য নেতা মনোরঞ্জন রায় ছুটে গিয়েছিলেন অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করতে। তিনি বললেন, শ্রমিকদের মনোবল নেই, তারা আলসে। স্ট্রাইক আর চালান যাবে না। সবাই এরকম ভাবছে। এমন সময় মালিকপক্ষ প্রস্তাব দিল স্ট্রাইক তুলে নিলে ত্রিপক্ষীয়

আলোচনায় বসা হবে এবং বোনাসও দেওয়া হবে। নেতারা বললেন, আমরা কিছু আদায় না করে শ্রমিকদের কি বলব? চারুদা তখন বললেন, কেন মজদুরদের একথা বলা যাবে না? ওদের এত ছোট ভাবছেন কেন? এখনও তো ওদের পরাজয় হয় নি। মালিক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য কিছু না দিলে আবার স্ট্রাইক ডাকা যাবে।

একটা ঘটনার উল্লেখ করলে চারুদার বুদ্ধিমত্তা ও সাহস কেমন ছিল বোঝা যাবে। চা-বাগানে তখন ৪৪টা ইউনিয়নের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির দখলে মাত্র ৪টে। স্ট্রাইক ডাকা হল। এখন প্রশ্ন হল, ৪টে চা-বাগানে নাহয় স্ট্রাইক হল, বাকীগুলোতে কি হবে? কংগ্রেসী ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ছিল কিরণ ভট্টাচার্য বলে একটি লোক। সে নিজে দুটো চা-বাগানের মালিক। আমাদের সঙ্গে ব্যবহার ও সম্পর্ক ছিল ভাল। এদের সঙ্গে জয়েণ্ট স্ট্রাইক করলে ১৩টি বাগানে কাজ হতে পারে। ওদের শর্ত হল, তার দুটো বাগানে স্ট্রাইক হবে না। চারুদা রাজী এক শর্তে, 'যদি কোনও বাগানে বোনাস নাও দেওয়া হয় তবে আপনার বাগান দুটোতে দিতে হবে।' পার্টিতে এ নিয়ে খুব বিরোধ হয়, কণ্ডিশন আরোপ করা কেন? চারুদা ভীষণ আশাবাদী ছিলেন যে এই সুযোগে ওদের ইউনিয়ন ভেঙ্গে নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারবেন। চারিদিকে দারুণ উৎসাহ, অন্ততঃ ৫০ ভাগ চা-বাগানে স্ট্রাইক সফল। হঠাৎ একদিন খবর হল ৫০০০ শ্রমিক তীর-ধনুক নিয়ে কিরণ ভট্টাচার্যের চাবাগান দুটো ঘিরে ফেলেছে সঙ্গে ৫০০ আর্মড পুলিশ। ওরা শ্লোগান দিচ্ছে, চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, মালিকের দালাল, ওদের হালাল কর। ওরা কিরণ ভট্টাচার্যের পয়সা খেয়েছে। অবস্থা সঙ্গীন। ডেপুটি সুপার বলল, আপনারা এখান থেকে পালিয়ে যান; আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি; তা নইলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

চারুদা চুপ করে একটু ভাবলেন। মজদুরদের মধ্যে তার অসম্ভব জনপ্রিয়তা। হিন্দীও ভালই বলতে পারতেন। বার্বড ওয়্যারের

বেড়ার পাশে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন অতি দ্রুত। ওদিকে জনতা মারমুখী। 'চারু মজুমদারের রক্ত চাই' শ্লোগান্ উঠছে মুহূর্মুহু। চারুদা হিন্দীতে ভাষণ শুরু করলেন। সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে বললেন। কি শর্তে, কোন্ উদ্দেশ্যে চুক্তি হয়েছে—দৃঢ়ভাবে রাখলেন সে কথা। কানু বলল, এরকম হিংস্র জনতাকে ফেস করার গাট্স চারুদা ছাড়া আর কারও থাকতে পারে ভাবাই যায় না। চারুদার আবেগমিশ্রিত কথা মজদুরদের অন্তর স্পর্শ করল। ওদের মারমুখীভাবে চারুদা যেন জল ঢেলে দিল।

চারুদাকে আমি বিভিন্নরূপে দেখেছি। ১৯৪৫এ ছাত্রদের মধ্যেও দেখেছি ভীষণ পপুলার ছিলেন। অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারার সময় একরকম স্বরে কথা বলছেন আবার কৃষকদের মিটিংএ তাঁর অন্যরূপ। কৃষকদের মিটিং-এ তাঁর আলোচনার ধরণই ছিল আলাদা। সবাইকে দিয়ে কথা বলাবার চেষ্টা করতেন। ঘরোয়া ভাবে শুরু করতেন। কখনও হাসাচ্ছেন, সামনের সারিতে যারা বসে আছে তাদের কোন একজনকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন। তাকে দিয়ে আবার বলাচ্ছেনও। কখনও আবেগে ভরপুর কখনও উত্তেজনায় অধীর, আবার কখনও ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে ক্রোধে উত্তাল। সমান তালে শ্রোতাদের নিয়ে চলেছেন তাঁর সঙ্গে।

কখনও দেখতাম চারুদা বিড়ি মুখে দিয়ে হাফ প্যান্ট পরে খালি পায়ে কারুর বাড়ীতে হাজির হলেন। সাংঘাতিক হৈচৈ পছন্দ করতেন। হুল্লোড়ে নিজেও মেতে উঠতেন। মেয়েরাও তাঁকে ভীষণ পছন্দ করত। শেষ পর্য্যন্ত যাঁকে চারুদা বিয়ে করলেন তাঁর সঙ্গে আগে থেকে খুব বেশী আলাপও ছিল না। চারুদার সঙ্গে বস্তুতঃ অনেক মেয়েকেই বেশী মিশতে দেখছি। ভাবিওনি তিনি লীলাদিকে বিয়ে করবেন। আর সম্পর্কের ব্যাপারে চারুদা ছিলেন ভীষণ গণতান্ত্রিক। বলতেন, লীলা আজ যদি আমায় পছন্দ না করে তবে অন্য কোথাও বিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে যাবার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারুর সঙ্গে থাকার চাইতে সম্পর্ক ভাঙ্গা অনেক ভালো। এক কথায়, সবরকমের কনভেনশন

ভাঙ্গার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। এবং ভাঙ্গতে গিয়ে তিনি যদি একাও হয়ে যেতেন তবুও কুছপরোয়া করতেন না। এরকম একটা ঘটনা বলি। কমিউনিস্ট পার্টিতে তখন একজন ভদ্রমহিলা পার্টি সদস্যা ছিলেন। তাঁর চরিত্রের খুব একটা সুনাম ছিল না। পার্টির আর একজন কর্মীর সঙ্গে তাঁর ভাব হয় এবং আগের বিয়েটা ভেঙে যায়। পরে তারা দুজনেই পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়। চারুদা অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাদের কলকাতায় নতুন ঘর সংসার বাঁধতে সাহায্য করেছিলেন। চারুদার প্রচলিত খারাপ মূল্যবোধগুলি ভাঙার ব্যাপারে অসম্ভব সাহস ছিল একথা সবাই জানত। আরেকজন এমনি সাধারণ মহিলা, যে সত্যিই দোষী ছিল চরিত্রের ব্যাপারে, অথচ অন্য কারণে তার উপর নিগ্রহ হয়েছিল, তখন চারুদার সঙ্গে আমিও রুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম এর বিরুদ্ধে। চারুদা বলতেন, ও যাই হোক না কেন, সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ও জাহান্নমে যাক না কেন। তাই বলে ওর ওপর কোন অন্যায় জলুম হলে বরদাস্ত করতে পারব না। চারুদাকে আমিও একবার ভুল বুঝেছিলাম। একদিন সন্ধ্যেবেলা দেখি চারুদা পার্টিরই একটি মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে নিমগ্ন আলোচনায় হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছেন রেল লাইনের ধার দিয়ে। দেখে আমি কি রকম শক্‌ড্‌ হলাম। ছিঃ, চারুদা এত খারাপ। এরকমভাবে একজন মহিলা কমরেডের একাকীত্বের সুযোগ নিচ্ছেন? বেশ কিছুদিন বাদে আমার ভুল ভেঙ্গেছিল। আমার সংকীর্ণ চোখ দিয়ে চারুদাকে দেখেছিলাম সেদিন। একটা আলোচনার সময় তিনি পাশের সঙ্গীকে মেয়ে হিসাবে ভাবেন নি; একজন কমরেড হিসেবেই দেখেছিলেন। একথা পরে চারুদার কাছে স্বীকার করতে অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিলেন, 'দূর পাগলা; তোকে আমি ভুল বুঝব কেন? তুই যা ভেবেছিস সেটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের চোখ তো দেখতে অভ্যস্ত নয় একটি ছেলে একজন মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটছে।' চারুদা ছিলেন মেয়েদের কাছেও সমান জনপ্রিয়। ওরা সোয়েটার বুনলে প্রথম প্রেফারেন্স পেতেন চারুদা। কি অদ্ভুত একটা জাদু ছিল লোকটার।

মনে আছে নকশালবাড়ী ঘটনার আগে আগে। ১৯৬৭ সালে দার্জিলিং জেলা কমিটির মিটিং হচ্ছে। রতনলাল ব্রাহ্মণের বাড়ি। রাত্রিবেলা তখন ১১টা বেজে গেছে। চারিদিক নিঃঝুম। শুধু সিংহ গর্জনের মত নিরঞ্জনদা নাক ডাকছে। চারুদা আমায় বললেন, 'ভদু চল, এই আওয়াজে ঘুম দূর অস্ত। তার চাইতে চল বাইরে বেড়িয়ে গল্প করি।' আমরা দুজন সেদিন হিপিদের নিয়ে আলোচনা করছিলাম। একমুখ দাড়িগোঁফ, ছেঁড়া জামাকাপড় পরা সাদা চামড়া ছেলে-মেয়েরা তখন সুখবৈভব ছেড়ে গরীব দেশ দেখতে বেড়িয়েছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে তখন হিপি আন্দোলন চলছে পাশ্চাত্য দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। চারুদা বললেন, 'এদের সম্বন্ধে আমি খুব আগ্রহী। এরা যে গাঁজা হাশিস খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকছে এটা মনে হয় সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একধরণের প্রতিবাদ। আপাতঃ দৃষ্টিতে এরা সমাজবিরোধী, সি-আই-এ চর মনে হলেও বিপ্লবী সংগ্রামে সম্ভাবনাপূর্ণ উপাদান।' এই ছিল চারুদার মত যা শুনলে কট্টর মার্কসবাদীরা কানে আঙ্গুল দেবে।

চারুদা মদ খাওয়া ব্যাপারটার ওপর কোন বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। তবে মদ খেতে খুব ভালোবাসতেন। বন্ধুবান্ধব কেউ আমন্ত্রণ জানালেই চলে যেতেন। স্কচ পেলে ছাড়তেন না! কেউ আড্ডা মারতে ডাকলে খোলাখুলি বলতেন ড্রিংক্স-এর ব্যবস্থা থাকলেই যাব। এমন দু-একটা নিমন্ত্রণে উনি অসুবিধেয় পর্য্যন্ত পড়ে যেতে পারেন এই আশঙ্কায় আমি ওনাকে যেতে দিই নি। চারুদা মদ খাওয়াটাকে দারুণ ডিফেণ্ড করতেন। বলতেন 'মদ খেয়ে একটু আনন্দ হবে, বেশী বকব, প্রগলভ হব এই জন্যই তো মদ খাওয়া।' একবার কমিউনিস্ট পার্টি চার্জশীট পর্য্যন্ত দিয়েছিল চারুদাকে, মদ খাওয়া নিয়ে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, চীনে একবার গিয়েছি ৬৮-৬৯ সালে হবে বোধ হয়। গণমুক্তিফৌজের একজন শীর্ষস্থানীয় কেউ, নামটা মনে পড়ছে না, আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা আপনারা ভারতীয় কমিউনিস্টরা মদ দিলে খান না কেন বলুন তো?

এর আগে দু-একটা ঘটনায় দেখেছি আপনাদের পার্টি কমরেডরা সরবৎ-টরবৎ নিয়ে বসে থাকেন। আপনাদের প্রলেতারিয়েত বা কৃষকরা কি মদ খায় না? আমি উত্তর দিলাম, 'হাঁ, খায় তো। কমরেডটি বলেছিলেন 'তোমাদের এই মদ না খাওয়া, অথবা আড়ালে মদ খাবার পেছনে কারণ নিশ্চয়ই হল হিন্দু ভণ্ডামী।' আমি চীনা জেনারালটির সঙ্গে একমত। চারুদাও বরাবর নিজের পছন্দ বা ভালো লাগাকে কখনও লুকোতেন না। এদিক দিয়ে তিনি সামন্ত-তান্ত্রিক মোটেই ছিলেন না বরং বলা যায় লিবারাল বুর্জোয়াই ছিলেন। আর লোকে কি বলল না বলল তা নিয়ে পরোয়াই করতেন না। হাঙ্গারী থেকে রিপোর্টার এসে তাঁর ঘরে কালীমূর্তি টাঙ্গানো দেখে তাঁকে কালীভক্ত বলে প্রচার করেছিল। ধর্মযুগ পত্রিকার একজন রিপোর্টার এসে চারুদার বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ ও কালীর ছবি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে চারুদা সাফ জবাব দেন—কালীর ফটো টাঙান থাকা বা না থাকায় আমার কিছু যায় আসে না। আর রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন সাংবাদিককে।—

যত বড় হও
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও
'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।

বললেন, এর কোন্ অংশটা আমরা সমর্থন করি না? পরে ধর্মযুগ পত্রিকায় বেরোল ঘটা করে যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির সম্পাদক ঘোর রবীন্দ্রভক্ত। চারুদার মানবতাবোধটা ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। চারুদা বলতেন, লেনিনের কাছে টলস্টয় যদি রাশিয়ার আয়না হয়ে থাকেন, শেক্সপীয়ার যদি স্তালিনের কাছে সর্বহারার নাট্যকার হ'ন তা'হলে কি দোষে রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব, ছুঁড়ে ফেলে দেবো? যে চারুদা বুক ফুলিয়ে সেই ১৯৬২ সালে বলতে পারেন 'আর কেউ না থাকলে আমিই বিকল্প পার্টি', সেই একই চারুদার প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের গানে—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ

না আসে তবে একলা চল, রে।" বড় প্রিয় গান ছিল চারুদার এটা। প্রায়ই গুনগুন করে তিনি এটা গাইতেন।

এই চারুদা আবার রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করা বা সেই উপলক্ষে নাটক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা খুব একটা পছন্দ করতেন না। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে শিলিগুড়িতে নাটক হবে 'রক্তকরবী'। চারুদা বললেন, একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁরই কিছু করতে হবে? মানিক বলেছিল, চারুদা, রক্তকরবী তো আমাদের ভালই লাগে।—হ্যাঁ, ভালো লাগার মত করেই তো প্রচার করা হয়। কেন, তোমরা দেখনি শেষ দিকে সমাজ বদলানোর যার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল সেই রঞ্জনকে মেরে রাজা প্রজার সাথী হয়েছে। এটা শ্রেণী সমন্বয় ছাড়া আর কি? শ্রেণীদ্বন্দ্বই হল ইতিহাসের মূল কথা, শ্রেণী সমন্বয় নয়। নাটকটা যদি করতে হয়, তাহলে বিশ্বভারতীর চূড়ামণিদের লিখে দেখতে পারো, তারা কি বলে। তবে মনে হয়, পাল্টানোর পারমিশন দেবে না। অন্ততপক্ষে তোমরা যে প্রতিবাদ করলে সেটাই ইতিহাস হয়ে থাকবে। এইরকম একটা সমস্যার বোঝা চারুদা এত তাড়াতাড়ি হাল্কা করে দেবে ভাবতেই পারিনি। চারুদা মার্গ সঙ্গীতও খুব ভালবাসতেন। মানিকতলায় আমার শ্বশুরবাড়ীতে খুব গান-বাজনার রেওয়াজ ছিল। চোঙ্গা গ্রামাফোন রেকর্ডে বড়ে গুলাম আলীখানের 'বাজুবন্দ খুলু খুলু যায়' বাজত, চারুদা মন দিয়ে শুনতেন। অনেকদিন শরৎচন্দ্র নিয়ে সরোজদার সাথে চারুদার তর্ক হত। চারুদা বলতেন, শরৎচন্দ্রের মহেশটা গল্পই হয়ে ওঠেনি। তারাশঙ্করকে খুব পছন্দ করতেন চারুদা। সরোজদা বলতেন, তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী, কংগ্রেসী। উত্তরে চারুদার কথা, 'আমার তো মনে হয় সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর সবচেয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন লেখক। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র মত একটা সমাজ সচেতন উপন্যাস দেখাও তো। গান্ধীবাদী হলেও আমার কিছু যায় আসে না।' এত গণতান্ত্রিক ছিলেন চারুদা। জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার চোখ ছিল তাঁর।

চারুদা তেভাগার আন্দোলনের সময় থেকেই কৃষকদের সঙ্গে

মিশছেন। গ্রামের কৃষকরা তাকে খুব ভালোবাসত; চোখের মণির মত করে রাখত। অন্যান্য কমরেডরা বাইরে থেকে গিয়ে মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে দেখা করত। জমির আন্দোলন তখন তুঙ্গে। গ্রামে গ্রামে সাহেবরা পুলিশ নিয়ে তাড়া করে। গ্রামের পর গ্রাম ঘেরাও করে চিরুনি অভিযান চালায়, নির্বিচারে কৃষকদের গ্রেপ্তার ক'রে মারধোর করে। তারই মাঝে চারুদা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন, লোক জড়ো করে প্রতিরোধে নামাতেন। লোকজড়ো করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এমন সুন্দর করে দেশজ ভাষায় কথা বলতে পারতেন স্থানীয় ঢঙে, যেন লোকগুলি সেই মুহূর্তেই লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বলার ধরণটা ছিল যেন কথা বলছেন। সাধারণ কথাও এমনভাবে বলতেন, লোকে ইনভল্‌ভড হয়ে পড়ত। এ ঘটনা অনেকেই দেখেছে।

চারুদাকে বরাবরই দেখেছি শোধনবাদ বা আপোষের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে, ঘৃণা করত। দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টি করার পর নেতৃত্বের প্রতি জন্মেছিল তাঁর এক প্রচণ্ড বিরূপতা। সিপিআই'র অমৃতসর কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে আমায় বলেছিলেন, 'ভূপেশ গুপ্ত একটা জঘন্য লোক, একদম সহ্য করা যায় না। কনফারেন্সে আমি কোন নোট নেবার প্রয়োজনই বোধ করিনি।' ১৯৬২ সালে ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় চারুদা পরিষ্কার বললেন সমস্ত দেশপ্রেমের জোয়ারকে উপেক্ষা করে, 'ভারত অনেকদিন থেকে চীনকে আক্রমণ করছে চীন তার জবাব দিচ্ছে। দেশের আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ দমানোর জন্য এছাড়া সরকারের কাছে অন্য কোন রাস্তা নেই। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্য দেশের সীমানা আগে লঙ্ঘন করে না এটা জেনে রাখবে। ভারত সরকার চীনকে আক্রমণ করেছে। তাই আমাদের উচিত এই যুদ্ধের বিরোধীতা করা।' চারুদা এসব কথা বলছেন এমন সময় যখন দেশ জুড়ে দেশপ্রেমের বন্যা। কংগ্রেসী গুণ্ডারা আমাদের তখন বলত 'চীনের দালাল চীনে যা, চাংচুং কইরা আরশুলা খা'।

কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট সংখ্যক কর্মীদের সঙ্গে চারুদাও জেলে গেলেন তাঁদের যুদ্ধবিরোধী অবস্থানের জন্য। জেল থেকে বেরিয়ে প্রথম পার্টি অফিসে ঢুকেই দেওয়ালে ডাঙ্গের ছবি দেখে টান মেরে ফেলে দিলেন। ডাঙ্গে তখন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক। ইংরেজদের লেখা আপোষের চিঠিগুলি তখন সবার কাছে জানা। চারুদা বললেন, শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা না থাকলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। শুধু ডাঙ্গেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সংশোধনবাদ আমরাও করেছি। অতীতে আমরা কোথায় ভুল করেছি তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে এগোবার দিন এসেছে। পুরোনকে না ভাঙলে নতুনের যাত্রাপথ উন্মুক্ত করা যায় না। আমরা সেই পার্টিতে আছি যে পার্টিতে ছিলেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ও মাও'র মত বিপ্লবী। আমরা সেই পার্টির সদস্য নই যে পার্টির সদস্য কাউটস্কি, ক্রুশ্চভ, ডাঙ্গের মত বিশ্বাসঘাতক। সংশোধনবাদ আমাদের সবকিছু অবিশ্বাস করতে শেখায়। বিপ্লবী অতীতকে ভুলিয়ে দিতে চায়। এই অবিশ্বাসের বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে বিপ্লবী নেতৃত্বকেই শোধনবাদীরা অস্বীকার করতে শেখায়। আর নেতৃত্বকে অস্বীকার করলে কোনদিনই বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

প্রায়ই চারুদা বলতেন, যে স্বপ্ন দেখেনা এবং অন্যকে স্বপ্ন দেখাতে পারে না সে বিপ্লবী হতে পারে না। সে সমস্যা দেখে অন্যের কাছে ছুটে যায় না। নিজেই সমস্যার সমাধান করে এবং নেতৃত্ব দিতে পারে। তার স্বপ্ন হল পুরোন সমাজকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়া। এই নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন সে কৃষককে দেখাবে যদি শ্রদ্ধার চোখ আর শেখার আগ্রহ নিয়ে তার কাছে যায়। এক্ষেত্রে বিপ্লবীর কাজটা সেতারির সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেতারির আঙ্গুলে সাতটি তার নানা ভাষায়, নানা সুরে কথা বলে, ঠিক তেমনি কৃষক বিপ্লবীর কাছে নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বলবে তার জীবনের অনেক গোপন কথা, যার মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজে পাব সমাজের অনেক রূপ, ছন্দ। সেতারি যেমন বারবার তার ছিঁড়তে ছিঁড়তে সৃষ্টি করে করে অপূর্ব সুর; ঠিক তেমনি গভীর থেকে গভীরতর শেখার প্রচেষ্টা

নিয়ে কৃষকের কাছে বারবার গেলেই আমরা খুঁজে পাব সেই শক্তি যা এই সমাজকে ভেঙ্গে গড়ে তুলতে পারবে নতুন সমাজ। কৃষকদের চুপচাপ দেখে আমরা ভাবছি তারা বোধহয় জলের মত ঠাণ্ডা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে হাজার বছর ধরে তাদের বুকের মধ্যে দারুণ জ্বালা জমে রয়েছে। ওটা জল নয়, কেরোসিন। তাই একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিলে তা নিভবে না। কারণ কেরোসিন তেলে দেশলাই কাঠি নেভে না, তা দপ্ করে জ্বলে উঠবে।

আর এই জ্বলে ওঠার কাজ মানুষকে নিয়ে, যন্ত্রকে নিয়ে নয়। তাই সেই মানুষের মধ্যে থাকবে ভয়, দ্বিধা, স্বার্থপরতা, তবু সেই মানুষই লড়াই করবে এবং এই সব কিছুরই বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তাকে জয় করে উঠে আসবে নতুন মানুষ, যে হবে নিঃস্বার্থ, আত্মদানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। বিপ্লবীরা মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদেন আর কাঁদেন বলেই তাঁরা পারেন মানুষের দুশমনকে খতম করতে। যারা ভয়-দ্বিধা-স্বার্থপরতা কাটাতে পারে না তারা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে চলে যায়। এই সমস্ত কথা মনে রেখেই আমাদের কাজে হাত দিতে হবে। হচ্ছে না বলে হতাশ হলে চলবে না। মানুষ ছোট ছোট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেই কেবলমাত্র বৃহত্তর লড়াইয়ের দিকে পা বাড়াতে পারে। হয়ত কোন সময় মনে হতে পারে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, জনগণ আমাদের কথায় কান দিচ্ছে না; তা দেখে ভয় পেলে ভুল হবে। বিপ্লবের বিকাশের নিয়মই হল তাই। অন্ধকারের মধ্যে যিনি আলোর নিশানা দেখাতে পারেন তিনিই হলেন প্রকৃত বিপ্লবী, আর এখানেই হল পার্টির সচেতন ভূমিকা।

সেই ১৯৬৫ সালেই চারুদা বুঝেছিলেন চারটি বিষয়ে সিপিএম থেকে আলাদা হবার উদ্যোগ নিলে তবেই বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠতে পারে। এক, বর্তমান যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা। দুই, ভারতের সর্বত্র বিপ্লবী অবস্থা আছে এই বিশ্বাস। তিন, এলাকা-ভিত্তিক ক্ষমতা দখলই ভারতীয় বিপ্লবের এগোবার মাধ্যম, নির্বাচন নয়। চার, কেবলমাত্র গেরিলা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই বিপ্লবের বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব। ভারতবর্ষ একটা ডিনামাইটে পরিণত হয়েছে, চারুদার

কথায়, আমরা শুরু করলে বুঝতে পারব কি তার বিস্ফোরণের ক্ষমতা।

চারুদা যতখানি রাজনৈতিক ছিলেন, রোমান্টিক ছিলেন বোধহয় তার চাইতে বেশি। মানবতাবোধটা ছিল বেশি মাত্রায় রোমান্টিক। শ্রীকাকুলামে গেছি, 'একজন ভূমিহীন কৃষকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল, ভাবা যায়?' তখন আমেরিকার সেক্রেটারী অব্ স্টেট কে ছিলেন নামটা ভুলে গেছি,- সে ভদ্রলোক গেরিলা যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলছেন, দুজন লোক—একজন পুরোদস্তর সামরিক সাজপোষাক পরা লোকের হাতে রাইফেল অন্যদিকে একজন গরীব চাষী শতচ্ছিন্ন পোষাক কিন্তু হাতে একটি রাইফেল, কে বেশি ভয়ঙ্কর? 'দেখ্ ভহ, বুর্জোয়ারাও পর্যন্ত একথা বুঝেছে।' আবার সেই চারুদাকেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা খুলে আবৃত্তি করছেন। তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ড জীবন। পুরোপুরি পরিবারের বাইরে। হয়ত শেলীর কবিতা আওড়াচ্ছেন। চূড়ান্ত অস্বাভাবিক পরিবেশ। ভাবাই যায় না। বাবার দৌলতে কালিদাস গুলে খেয়েছেন। আমাকে বলছেন—বিরহযক্ষের রোমান্টিকতা একজন বিপ্লবীর হবে না কেন?—চারুদা পুরোপুরি সঠিক ছিলেন এই ক্ষেত্রে। একজন গরীব চাষীর মনে জমির বাইরে আকাঙ্ক্ষা তৈরী করতে না পারলে. সে বড় জায়গায় আসতে পারবে না।

চারুদা বলতেন, পুরোন ধাঁচের গণসংগঠনগুলি সংশোধনবাদের জন্ম দেয়। উনিশ শতকে মার্কসের তৈরী সংগঠন বিশ শতকে এসে হয়ে গেছে অপর্যাপ্ত, সংশোধনবাদী। আর সেখানেই লেনিনের ক্রেডিট। সংগঠন যে চূড়ান্ত নয় আপেক্ষিক, এটা চারুদা সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি বলেছিলেন পুরোন ধরনের গণসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। আগের আমলের কৃষকসভা বা ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজন নেই। এখানেই চারুদার ক্রেডিট। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা চারুদা যত তীব্রভাবে এনেছেন তা ভারতে এর আগে কেউ আনে নি। এই দৃঢ়তা চারুদার যতখানি ছিল অন্যের মধ্যে তা দেখিনি। কানুবাবুর কথাই ধরা যাক। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ীতে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ ঢুকেছে। তছনছ করছে ঘরবাড়ী। হাজারের

উপর লোক গ্রেপ্তার। বিপ্লবীরা পেছু হটছে। এই অবস্থায় একদিন সকালে চারুদার বাড়ীতে গেছি। কানুবাবুর একটা চিঠি দেখালেন। লেখা আছে—'বুড়াগঞ্জের এই এলাকায় পুলিশ মিলিটারী পুরো ঘিরে ফেলেছে। আর কোন আশা দেখছি না। এখানে থাকার আর কোন মানে দেখছি না। ভাবছি পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে চীনে চলে যাব।' পরদিন চারুদা আর আমি গাড়ী নিয়ে ওদের উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম আটকানো অবস্থা থেকে। মোটর রিপেয়ারিং গ্যারেজে গেলাম। ড্রাইভার আমাদের ইউনিয়নের লোক। সন্ধ্যা ৬টায় চারুদাকে ওর বাড়ী থেকে তুলে নিলাম। জীপটা শুকনো নদীর কালভাটের সামনে এসে দাঁড়াল। ৭ জনকে আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এলাম। এদের মধ্যে কানুবাবুও ছিলেন।

চারুদার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। যে ৭ জনকে আমরা ঘিরে ফেলা অবস্থা থেকে বাঁচালাম তাদের মধ্যে দুজন—কামাখ্যা ও ফণিকে—চারুদা বরাবর দোদুল্যমান চরিত্র বলে সন্দেহ করতেন। এবং বাস্তবিকই তাই, এরা পরে পুলিশের কাছে সারেণ্ডার করেছিল। আরেকজনের কথা বলি, তার নাম ছিল খোকন, ওর মধ্যে একটা নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক ছিল। একটু অদ্ভুত টাইপের। অফিসিয়ালি পার্টিতে যা ঠিক হত ও তার বিরুদ্ধে গোপনে দল পাকাত। একবার চারুদাসহ আমরা গিয়েছিলাম মাঝারী চাষীদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করতে যাতে অভুক্ত গরীব চাষীদের মধ্যে ধান বিলিয়ে দেওয়া যায়। চাষীরা বলল, 'ঠিক আছে, ধান আমরা দিতে পারি, কিন্তু বস্তাগুলি ফেরত দিতে হবে।' ২০০-২৫০ মণ ধান উঠেছিল। খোকন বলেছিল, 'বস্তাটস্তা ফেরত দেব না।' চারুদা এই কথা শুনে বলেছিলেন, 'এ তো কৃষক আন্দোলনের পক্ষে সাংঘাতিক এলিমেন্ট।' ওর প্রতি ভালভাবে নজর রেখো তো।' চারুদার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। খোকন চারুদার বিরুদ্ধে তলে তলে সমালোচনা করত। কিছুটা ডাক্তারি জানার সুবাদে ইঞ্জেকশন দিয়ে পয়সা নিত। পরে নিজের নামে জমিও কিনেছিল। সাধারণ কর্মীদের ওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগও ছিল। আর চারুদার কর্মীদের

প্রতি মমত্ববোধ ছিল অসাধারণ। একবার লড়াইয়ের সময় চা বাগানে এক শ্রমিকের বাড়ী। কানুবাবু এলেন ক্লান্ত, চারুদাকে দেখেছি নীরবে কানুবাবুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। স্নেহের এই প্রকাশ দেখে আমি সেদিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

নিজেকে নিয়ে চারুদা ঠাট্টাও করতে জানতেন। বড় মাপের মানুষদের যেটা স্বাভাবিক পরিচয়। ১৯৫৫ সালে পার্টির বিকল্প সরকারের ডাক ছিল। নির্বাচনে হেরে গিয়ে আমরা ঠাট্টা করেছি, চারুদা হেসেছেন। আর ছিল কমরেডদের জন্য সংস্কারমুক্ত চিন্তা। বস্তুতঃ আমি অনেক পরে বিয়ে করি। এবং প্রথম যোগাযোগটায় চারুদাই ছিলেন। আমার স্ত্রী এখন মারা গেছেন। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, এত দরদ খুব কম মানুষেরই মধ্যে তিনি দেখেছিলেন। কেন বিয়ে করেননি, একথা কেউ আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন নি। আমি দেখেছি, ভারতের অনেক নেতাই মেয়েদের সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা পোষন করতেন। মুজঃফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত এঁরা মনুর মতই মনে করতেন মেয়েরা নরকের দ্বার। চারুদা ছিলেন এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। নিজের কোন ভুল ধরা পড়লে স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। তাঁর নামে ব্যক্তিপূজা যদি, করা হয়ে থাকে তারজন্য চারুদা নিজে এতটুকু দায়ী ছিলেন না। বস্তুতঃ চারুদার শ্লোগান ছিল এটা—'নয়া ভারতের নয়া নেতা জঙ্গল সাঁওতালের মুক্তি চাই।' ১৯৭০ সালে সিপিআই (এম-এল) এর পার্টি প্রোগ্রামের যে খসড়া চারুদা করেন তা পার্টি কংগ্রেসে প্রত্যাখ্যাত হয়। আমার, সুশীতল রায়চৌধুরী ও শিবকুমার মিশ্র'র খসড়াটি গৃহীত হয়। পরে চারুদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমার লেখা গৃহীত হবে না জানতাম। আমি তো লিখতে টিখতে পারি না। ১৯৬৭ সালে চীনে গিয়ে মাও সে তুঙ-এর সঙ্গে দেখা হলে অন্যান্য কথার মধ্যে চারুদার স্বাস্থ্যের কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন। ১৯৭০-এ যখন চীনে যাই, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে। কয়েকটি বিষয়ে তারা আমাদের পার্টির কাজের বিশ্লেষণ করে সমালোচনা করেন। তারা বলেন 'তোমাদের সাধারণ

দিশা ঠিক আছে কেবল কয়েকটি নীতি উপযুক্ত নয় এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও-চিন্তাধারা সম্মত নয়। কৃষকদের মৌলিক স্বার্থ ও কৃষি সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র সংগ্রামের কোন ভিত্তি থাকে না। তাই তা সফলও হয় না।' চীন থেকে ফিরে এসে আলাদা করে চারুদার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। তবে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরীতে চারুদার সঙ্গে আধঘন্টার মত কথা হয়। তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'কিছু একপেশে কাজ তো আমাদের হচ্ছেই'। আমি তার একমাসের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে যাই। তার কয়েকদিন আগে একটি মৌখিক বার্তা পাই লীলাদির মারফৎ 'তুমি খুবই সাবধানে থেকো। পার্টির নেতৃত্ব মজবুত নয়। সুশীতলবাবু আলাদা হয়ে গেছেন। সরোজবাবুর গণ-আন্দোলনে অভিজ্ঞতা না থাকায় নেতৃত্বে তেমন কার্যকরী হবেন না। তোমকে অনেক দায়িত্ব নিতে হবে।'

আমি চারুদার দেওয়া সেই দায়িত্ব বহন করতে পারিনি। জীবনকে জীবনের চেয়ে বড়ো করে দেখার স্বপ্নে মশগুল মানুষটি আমার কাছে ছিলেন হ্যামলিনের সেই বাঁশীওয়ালা। তাঁর সুরের টানে আমরা যেন অন্ধের মত পেছন পেছন ছুটে কোথায় হারিয়ে গেলাম।

খোকনের কথা

আমার নাম আবদুল হামিদ। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে, বিশেষ করে, উত্তর বাংলায় যাবার পর আমার নাম পালটে রাখা হয় খোকন। প্রথম জীবনে কলকাতায় কাজ করতাম লেকের কাছে মিলিটারি হাসপাতালে। ইউনিয়ন করতাম হাসপাতালে। একবার স্ট্রাইক করার সময় ১৯৪৯ সালে আমাকে কলকাতা থেকে ১২ ঘন্টার নোটিশে চলে যেতে বলে। আমি গিয়ে আবার ফিরে এলে গ্রেপ্তার হয়ে যাই। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দু-বছর কাটালাম। এরপর বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে কাটিয়ে বাইরে আসি। পরে পার্টির হয়ে রিলিফের কাজ করি পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। আমার আর্থিক অবস্থা

তখন নিতান্ত সঙ্গীন, দুবেলা খাওয়া জোটে না। এইরকম কিছুদিন চলতে থাকার পর হঠাৎ একদিন রাগ করে দার্জিলিং-এ চলে গেলাম আমার এক বন্ধুর কাছে। কম্পাউণ্ডারীটা কিছুটা জানতাম, মিক্সচার বানাতে পারতাম, ইঞ্জেকশন দিতে পারতাম। রোহিনী চা বাগানে একটা চাকরীর প্রস্তাবও পেলাম। চাকরীটা অবশ্য নিই নি। ১৯৫৪ সালের ২৪শে এপ্রিল শিলিগুড়িতে কৃষক সম্মেলনে যোগ দিই। ওখানেই চারু মজুমদারের সঙ্গে দেখা হয়। সম্মেলনে চারুবাবুর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়। উনি যে অত নামীদামী লোক তা অবশ্য তখন জানতাম না। রোগাসোগা ছোটখাট মানুষ। তাঁর বক্তব্য ছিল ট্রেড ইউনিয়ন করলেই পার্টি করা হয় না। আমি এর বিপক্ষে ছিলাম। পরে অবশ্য তাঁর কথা মেনে নিই। আমি তখন গ্রামে বসে গেছি। কৃষকদের মধ্যেই আছি। প্রত্যেক সপ্তাহে, মাসে অথবা আন্দোলনের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হত। গ্রামে আমরা টাকা পয়সার জন্য কোন অভাববোধ করি নি। আমাদের প্রয়োজন কৃষকরাই মেটাত। চাঁদার টাকা আমরা পার্টিতে জমা দিতাম। ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি অঞ্চলে আমরা পায়ে হেঁটেই ঘুরতাম। আমাদের কাছে পয়সাও থাকত না খুব বেশী।

একবারের কথা মনে আছে। আমার তখন কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। একদিন মাঠে এসে বেহুঁশের মত শুয়ে পড়ি। চারুবাবু নাড়ি দেখে আমায় বললেন, কেমোকুইন খাও। আমার কাছে পয়সা ছিল না অথচ ওষুধের ব্যবস্থা করে দেননি। পার্টির কর্মীদের প্রতি তাঁর এই মনোভাব তখন আমার পছন্দ হয়নি। রাজনৈতিকভাবে অবশ্য তাঁর সমস্ত বক্তব্য মানতাম। রাজবংশী ভাষায় সহজাত দখল ছিল তাঁর। জনগণের ভাষায় হাসিয়ে কাঁদিয়ে বক্তৃতা দিতে পারতেন। সবাইকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন, কানু বা সৌরেন সবাইকে। সেই সময় তাঁর বাবার সঙ্গে তাঁর বেশ তর্কবিতর্ক হত। উনি বোধহয় পরোক্ষে চারুবাবুকে সমর্থনই করতেন। বলতেন, আগেকার কংগ্রেস অনেক আদর্শবাদী ছিল, এখন অনেক খারাপ হয়ে গেছে। তিনি চারুবাবুকে রাজনীতি করতে বাধাও দেন নি। লীলাদিও পার্টি মেম্বার ছিলেন। ওদের

সেই কাঠের বাড়িটার বাইরের ঘরে আমরা প্রায়ই যেতাম। মাঝে-মাঝেই চা-টা আসত।

১৯৬০ থেকে ৬২'র মধ্যে চারুবাবু খুব সম্ভবত প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছিলেন। মদটদ খেতেন প্রচণ্ড। রিকশা থেকে রাস্তায় পড়ে গেছেন এমনও হয়েছে। ১৯৫৯ সালে তিনটি থানা এলাকায় বেনামি জমি দখলের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তার কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে যায়। সেইজন্য হয়ত হতাশা এসেছিল। ১৯৬২-তে ভারত চীন সীমান্ত যুদ্ধের সময় বোধহয় তাঁর হতাশা কেটেছিল। চারুবাবু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ প্রথম আমাদের জেলা থেকে ভারতকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেন। উত্তর বাংলার আন্দোলন রাঢ় বাংলার থেকে পৃথক। বেনামী জমির আন্দোলন ছিল প্রচণ্ড জঙ্গী। আন্দোলনের সময় হাতিয়ার নিয়ে হাজার হাজার কৃষক হাজির। তাই মনে আছে—কাকদ্বীপে যখন কৃষক সম্মেলন হয় তখন দার্জিলিং-এর কমরেডরা আলাদা ট্রিটমেন্ট পেতেন। চারুবাবুকে দেখে মনে আছে সম্মেলনে অনেকে ফিস্‌ফাস করে বলে 'ক্ষুদে গেরিলা আসছে'। চারুবাবুর এই সময় যে বক্তৃতা শুনেছে সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। বক্তৃতা দিয়ে হাসিয়ে দিতে পারতেন এবং পরমুহূর্তে শ্রোতাদের চোখ ছলছল করিয়ে দিতে পারতেন আবেগে।

১৯৬২'র প্রথমেই আমি জেলে যাই এবং পরের বছর ছাড়া পাই। পার্টির উপর তখন দমনপীড়ন চলছে এবং পার্টির ভেতরে অনেক ভাঙচুর হচ্ছে। উপনির্বাচনে চারুবাবুকে দাঁড় করান হয়। চারুবাবু অল্প ভোট পেয়ে হেরে যান শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে। চারুবাবুর চালচলন ও রাজনীতি রাজ্য পর্যায়ের নেতারা পছন্দ করতেন না। নেতৃত্বের সঙ্গে কোথায় যেন একটা দ্বন্দ্ব ছিল। ১৯৬৪ সালে পার্টি কনফারেন্স হল। পার্টি কনফারেন্সের আগে জেলাস্তরে যে সম্মেলন হয় তাতে চারুবাবুর সঙ্গে আমার বিরোধ লাগে। জেলা কমিটিতে এগারজন থাকবেন। নির্বাচনে গ্রামের কৃষকরা আমার নাম করেছিলেন কিন্তু নেতারা লীলা মজুমদারকে চাইছিলেন। গোপন ব্যালটে আমি হেরে গেলাম।

অথচ দেখুন তিনি ছিলেন পার্টির পার্ট টাইমার আর আমি ছিলাম হোল টাইমার।

চারুবাবু ১৯৬৪'র শেষের দিকে পার্টির কেন্দ্রীয় লাইনের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খলভাবে না হলেও বলা শুরু করেছিলেন। এই সময়টা তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা আবার গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাই। বাইরে তিনি তখন বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর রাজনৈতিক লাইনের কথা ভাবছেন, সশস্ত্র সংগ্রাম, গেরিলাযুদ্ধের কথা। তখন চীনা পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান লিন 'পিয়াও'র 'জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবি হোক' শীর্ষক পুস্তিকার কথা শুনি। জেলে তখন আলাদা করে ক্লাস শুরু হয়। এখনকার সিপিআই (এম)-এর বীরেন দে সরকার, শিবেন চৌধুরী এঁরাও আমাদের ক্যাম্পের লোক ছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকেই বুঝতে পারছিলাম নির্বাচনে মৌলিক পরিবর্তন হবে না। ১৯৬৪র পার্টি সম্মেলনে চারুবাবু প্রথম তাঁর বক্তব্য রেখে পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধটা প্রকাশ্যে আনেন। কিন্তু কোন দলিল দেন নি। ১৯৬৫ সালে তিনি আমরা জেলে থাকাকালীন প্রথম দলিলটি লেখেন যেটা কালিম্পং থেকে পিটিআই-এর রিপোর্টার প্রকাশ করে দেয়। প্রতিটি কাগজ তাই নিয়ে হল্লা শুরু করে দিল। সেই সময় দালাই লামার ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় পুলিশ সাংবাদিকের খুব ভীড় ছিল কালিম্পং-এ। এই দলিলে তিনি ভারতের তৎকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার সাংগঠনিক আওয়াজ রাখলেন যার প্রধান ভিত্তি হল কৃষি বিপ্লব। জেলের মধ্যে আমরা এগুলি শুনে তখন দারুণ উৎফুল্ল। যাক বাইরে একটা কিছু হচ্ছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পড়ছি। জেলে অন্যান্য দলিলও কিছু পেতাম। আর ক্লাসিক বইগুলি যেমন লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পড়ছি। বিপ্লবীগ্রুপের আমরা তখন অন্যান্যদের ঠাট্টা তামাসা ও আক্রমণের সম্মুখীন।

চারুবাবুর দলিলগুলি নিয়ে আলোড়ন উঠেছিল পার্টির উপর মহলে। শোনা গেল রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত আসছেন চারুবাবুর সাথে বৈঠক করতে। কানু সান্যালও কামতাগুড়ি ছুটে এলেন। জেলা কমিটির সবাই বোধহয় ছিলেন। এই আলোচনাটা পরে কানুবাবুর

কাছে শুনেছি। প্রমোদবাবু আলোচনা শুরু করেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি কি, বিভিন্ন গণ-আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে কিভাবে বাংলার সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। সবশেষে তিনি চারুবাবুর দলিলের উপর আক্রমণ করে বসেন। আলোচনা তুঙ্গে ওঠে। প্রমোদবাবু চুরুটে টান দিয়ে বলেন—'পার্টির একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। চারুবাবু সেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এমন কি আমার কাছে এ খবরও আছে যে দলিলগুলি প্রকাশ করার আগে তিনি স্থানীয় কমরেডদের সঙ্গেও আলোচনা করেননি। অনেকের কাছে খবর নিয়ে আমি জেনেছি যে তাঁরা জেলে থাকাকালীন খবরের কাগজে জানতে পেরেছেন কমরেড চারু মজুমদার কয়েকটি দলিল লিখেছেন ভারতবর্ষের কৃষি বিপ্লবের উপর। এই ধরণের কাজকে আমি পার্টির প্রতি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বলে মনে করি। কারণ কোন পার্টি সদস্যের ক্ষমতা নেই কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন রাজনৈতিক দলিল বাইরে প্রকাশ করেন।'

প্রথম প্রথম কানুবাবু মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন। চারুবাবুও ছেড়ে দেন না। পার্টির সংশোধনবাদী মুখোস টেনে খুলে দেন। তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁর সিদ্ধান্তে অটল, চারুবাবুকে তার সমস্ত দলিল প্রত্যাহার করতে হবে এবং এই ধরণের কাজের জন্য লিখিত ক্ষমা চাইতে হবে। কানুবাবু মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন, যুক্তি দেন—পার্টির একটা সাংগঠনিক এলোমেলো অবস্থার জন্যই এটা ঘটেছে। সবাই তখন জেলে, সুতরাং চারুবাবু সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাবেন কোথায়? প্রমোদবাবু কোন যুক্তি মানতে রাজী নন। চারুবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'আমি যে রাজনৈতিক দলিল লিখেছি তা উইথড্র করার কোন প্রশ্নই আসে না। যদি প্রয়োজন মনে হয়, পার্টি থেকে আমাকে লিখিত চার্জশীট দেওয়া হোক। তারপর আমার লিখিত জবাব যা হয় আমি দেব।' প্রমোদবাবু গম্ভীর। আলোচনা আর এগোল না। একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে আমরা শুনতে পেলাম প্রমোদবাবু চারুবাবুকে বলছেন—'মশাই, আপনি দেখছি বাড়ীর ছাদ থেকে বিপ্লবকে দেখতে পাচ্ছেন।'

এরপর দীপক বিশ্বাসসহ আরও তিনচার জন তিনটি থানায় রাজনৈতিক কাজ শুরু করেছিল। আমরা কমব্যাট গ্রুপ বা সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে গণআন্দোলন যুক্ত করার পক্ষে ছিলাম। ওরা ছিল এর বিরোধী। চারুবাবু তখন জোতদারদের উপর আক্রমনের ব্যাপারে কমব্যাট গ্রুপের পক্ষে ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোন উগ্র মনোভাব তখন দেখিনি। তখন থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি চারুবাবুর মধ্যে ব্যবহারিক পরিবর্তন তাঁকে মৌলিকভাবে পাল্টে দিয়েছে। কর্মীদের প্রতি বন্ধুত্ব ও দরদের ভাব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ী সময়ের ঘটনা। কমরেডদের জীবন বিপন্ন হলে চারুবাবু কেমন উতলা হতেন। দেওমুনি টি এস্টেটের কাছে বেজায় পুলিশ রেড চলছে। নকশালবাড়ি শিলিগুড়ি রোডে মিলিটারী কনভয় চলাচল করছে। জঙ্গলে আমরা ৮-জন আটকা। চারুবাবু নিজে একজন সমর্থকের জীপে করে এসে আমাদের উদ্ধার করে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ওখান থেকে তিনি আমাদের পরের শেলটারে পৌঁছে দিলেন। এই সময় থেকেই আমাদের সম্পর্ক তুমির অন্তরঙ্গতায় নেমে এসেছে। এরপর তিনটে থানাকে ৩/৪টে ভাগে ভাগ করে নিয়ে কাজ করছিলাম। লোক মারফত আমরা চারুবাবুকে কাজের রিপোর্ট পাঠাতাম।

রাজনৈতিক বিশ্বাস দৃঢ় হবার পর চারুবাবুর মধ্যে সামাজিক ও মানবিক উভয় দিক দিয়ে পরিবর্তন দেখা দিল। ফলে কর্মীদের প্রতি তার ব্যবহারেও দেখা গেল অনেক বেশি মানবিকতা। ১৯৬৭ সালে আমরা চীনে যাই। এর আগে নেপালী ছেলে কৃষ্ণভক্ত শর্মাকে দলিল-পত্র দিয়ে চীনে পাঠান হয়। বিপ্লবী উদ্দীপনা কিরকম থাকতে পারে, কৃষ্ণভক্তের ঘটনা না শুনলে বোঝাই যাবে না। নেপালে পায়ে হেঁটে গিয়ে পৌছোলে পরে সেখানে পুলিশের হাতে সে ধরা পড়ে। জেলে চালান হয়। জেল ভেঙ্গে সে পালায় তিব্বতের উদ্দেশে। তিব্বতী দস্যুদের খপ্পরে পড়ে কৃষ্ণভক্ত। ওরা তার মাথায় লবণের বস্তা চাপিয়ে দেয় বইবার জন্য। দূরে পাহাড়ে সেই সময় শুকনো গাছপালায় আগুন ধরে যায়। সেই সুযোগে কৃষ্ণভক্ত দৌড়ে পালিয়ে যায়। পাহাড় দিয়ে দৌড়োতে গিয়ে পড়ে যায়। অতি কষ্টে নদী পার হয়ে চীনে পৌঁছোয়।

চীনারা তাকে ধরে জানতে পারে তার আসার কারণ। তাকে পিকিংএ পাঠালো চীনা মুক্তিফৌজের সৈনিকরা। ঠিক ঐ সময় অন্য রাস্তায় ছটা শৃঙ্গ পার হয়ে আমরা চীনে গিয়ে পৌঁছোই। তিন মাস ছিলাম। চীনারা ট্রেনিং দিয়েছিল। চিংকাংশাং পাহাড়ে গণমুক্তিফৌজের লড়াইটা ওরা বহু টাকা খরচ করে আমাদের দেখিয়েছিল। ওরা বলেছিল তোমরা একবছর থাক। আমরা থাকতে চাই নি কারণ দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে, আমাদের সেখানেই বেশি দরকার। চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের সঙ্গে ওরা দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল। গ্রেট হল অফ দ্য পিপল-এ একটা বেশ বড় বসার ঘরে মাও-এর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মাও ঢোকেন। উত্তেজনায় আমরা অধীর। চেয়ারম্যান আমার পাশেই বসলেন, সঙ্গে দোভাষী। আলাপ পরিচয়ের পালা শুরু হল। প্রত্যেকের সম্পর্কে তিনি তিনটে জিনিষ জানতে চাইলেন, কি নাম, কোন শ্রেণী থেকে এসেছেন আর শিক্ষার মান। আমি তো মহা মুশকিলে পড়লাম। লেখাপড়া করেছি কিন্তু সেরকম পাশ-টাশ তো করিনি। ডিগ্রীটিগ্রীও নেই। আমার আড়ষ্টতা দেখে মাও জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কি? দোভাষী তাঁকে ব্যাপারটা বলতেই মাও জোরে হেসে উঠলেন তারপর বললেন, পরীক্ষার ডিগ্রীটাই বড় কথা নয়, আমি নিজে আরণ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। আমরা তারপর আমাদের দেশের অবস্থার রিপোর্টিং রাখলাম। সেসব শোনার পর মাও আস্তে আস্তে বললেন, ভারতের মানুষকে নিজেদেরই লড়াই করতে হবে দেশের মুক্তির জন্য। চীনা জনগণ অন্যান্য পরামর্শ বা অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন এই পর্যন্ত। এরপর মাও চারুবাবুর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং সিগারেটের প্যাকেট দিয়েছিলেন যা আমি চারুবাবুকে দিয়ে দিই পরে।

পার্টি গঠনের পর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলি। তখন রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুশীতল রায় চৌধুরীর সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের বিরোধ চলছিল মতাদর্শগত স্তরে। সুশীতলবাবুকে বের করে দেবার পক্ষে সবাই রায় দেন, সৌরেনবাবু, কানুবাবু সবাই। শুধু চারুবাবু এর

বিপক্ষে ছিলেন। মনে আছে মিটিং ঘরে ধোঁয়ায় ভর্ত্তি। চারুবাবু খুব সাফোকেশন বোধ করছিলেন তাই বাইরে এলেন। তখন বললেন, সুশীতলবাবুকে বহিষ্কার করার ওরা কে? তবে তাঁকে যতক্ষণ আরেকটা কংগ্রেস হচ্ছে ততদিন মেজরিটির মত মেনে চলতে হবে। সবাই কিন্তু দাবী করছে তাঁর সঙ্গে মতপার্থক্য মীমাংসার বাইরে সুতরাং তাঁকে এক্সপেল করা হোক। চারুবাবু তাঁর সিদ্ধান্তে অচল। সুশীতল-বাবুকে বার করা চলবে না।

চারুবাবুর সঙ্গে আমার দেখা মারা যাবার মাস দেড়েক আগে। অনেক কষ্ট করে কলকাতায় আসি। বহুদিন দেখাশুনো নেই, অনেক প্রশ্ন ও সংশয় উঠেছে। তাই তার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করে সব জানা দরকার। তার আগে স্থানীয় দুজন পার্টি নেতা অগ্নি রায় ও কমল সান্যালকে খতমের লাইন সম্পর্কে প্রশ্ন তোলায় নিজেদেরই খতম হতে হয়েছে নিজেদের কমরেডের হাতে। আমি এসেই তৎকালীন নেতা মহাদেব মুখার্জী ও দীপক বিশ্বাসকে চার্জ করি। ওরা কান্নাকাটি করে পরে অবশ্য ত্রুটী স্বীকার করে। চারুবাবু তখন মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। তবে নতুনভাবে চিন্তা করছেন যার ছাপ পাওয়া যায় 'জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ' লেখাতে। উনি বললেন, তাহলে ওরা সুনীতিবাবুর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেছে? উত্তরবঙ্গের রিপোর্ট দিলাম। কিন্তু তিনি কোন বিশেষ নির্দেশ দেননি। এটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে খারাপ লোকজন তাকে ঘিরে আছে।

অর্জুনের কথা

কমরেড সিএম এর কথাকে জানা বা মনে রাখাটাই খুব বড় কথা নয়। আসল কথা হল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা গ্রহণ করা। আর এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর কথা বলতে গেলেই ব্যক্তিমানুষটা এসে পড়ে। সিএম কারুর সঙ্গে কথা বললেই সব সময় চোখে চোখ রেখে কথা বলতেন। সে সময় অন্যের মুখ দেখেই বলে দিতে পারতেন লোকটি আসলে কি বলতে

চাইছে। তখন সত্তরের আন্দোলন ধাক্কা খেয়েছে। চীনা পার্টি এগার পয়েন্ট সমালোচনা পাঠিয়েছে। তখন সিএম এর চার্জে ছিলেন স্নীতিবাবু। অর্থাৎ তাঁর হাতে সিএম এর দেখাশুনোর ভার। শেলটার ঠিক করা, তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। মনে আছে অন্ধ্র প্রদেশের আবদুর রাউফ সিএম এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা একদম অবর্ণনীয়। প্রায় চলচ্ছক্তিহীন। চীনা পার্টির মন্তব্য সম্বন্ধে রাউফ চেয়েছিলেন, জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার মত সাহস পাননি। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে রাউফ স্নীতিবাবুকে বলেন, আপনিই সিএমকে জিজ্ঞেস করুন। তখন শেষমেশ স্নীতিবাবু বলেন, 'আমাদের পার্টির সামনে যে সময়টা পেরিয়ে গেল তার সাফল্য আছে অনেক আবার পাশাপাশি অনেক সমস্যাও আছে। কমরেডরা চাইছেন আমাদের অভিজ্ঞতার সার সংকলন করা দরকার। সিএম শুনেই বুঝতে পারলেন স্নীতিবাবু কি বলতে চাইছেন। 'বেশ তো আপনারাই করুন।' এই দুটো কথাতে সিএম বুঝিয়ে দিলেন তিনি কি বলতে চাইছেন। ভুলটাই প্রধান এরকম কোন সিদ্ধান্তে তিনি একমত, ছিলেন না।

স্নীতিবাবু প্রশ্ন করলেন—'আমরা বলতে?'

সিএম—আপনিই তো ভালো লেখেন।'

স্নীতিবাবু—'আপনি থাকতে আমি কেন?'

সিএম এর জবাব—'মূল্যায়ণ করতে হলে আপনারা লিখুন।' তখন স্নীতিবাবু বুঝতে পারলেন সিএম কি বলতে চাইছেন। অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা ছিল। মুখ দেখলেই বুঝতে পারতেন অপরজন কি বলতে চাইছে।

আরও দুটো ঘটনা এই সিদ্ধান্তের সাক্ষী। প্রথম ঘটনার সময় ১৯৭০ সাল। উত্তর কলকাতা। দুজন মাস্টারমশাই সরোজ দত্ত মারফত সিএম'এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। একজন সকালে এসেছিলেন, দ্বিতীয়জন বিকেলে। সকালের মাস্টার মশাই বললেন—পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছি শহরে থাকব না। সারাক্ষণের কর্মী হয়ে গ্রামে কাজ করতে চাই। সিএম আনন্দে বিহ্বল হয়ে সেই মাস্টার-মশাইকে

জড়িয়ে ধরলেন। লাল সেলাম জানিয়ে তাকে বললেন—'আপনাদের জন্য আমি বিশ্বাস পাচ্ছি। ভারতবর্ষে বিপ্লবের গতিরোধ করার সাধ্য কারুর নেই।' ভয়ঙ্কর ইমোশনাল ছিলেন। আবেগে তাঁর চোখে এসে গেল জল। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ, অসাধারণ মুহূর্ত। বিকেলবেলায় আরেক ঘটনা, আরেক ক্লাইম্যাক্স, দ্বিতীয় মাস্টারমশাইটি এসে হাজির। সিএম এর সঙ্গে দেখা করে শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, আপনার আবেদনে সাড়া দিয়ে দলে দলে তরুণ গ্রামে যাচ্ছে —এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে আমি স্থির থাকতে পারছি না। ভাবছি আমারও চাকরী ছেড়ে দিয়ে গ্রামে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে আপনি আমায় কি করতে বলেন? সিএম অদৃশ্য মাছি তাড়ানোর মত হাত নাড়িয়ে বললেন, দূর্, আপনি গ্রামে যাবেন কেন? শহরে কত কাজ রয়েছে। কত নতুন নতুন তাজা ক্যাডারকে রাজনৈতিকভাবে তৈরী করে আপনি তো গ্রামে পাঠাতে পারেন? কলকাতায় থেকেই কাজ করুন না।

আশ্বস্ত হয়ে মাস্টারমশাই উত্তর করেন—'তাহলে আপনি বলছেন থাকতে?' এরপর চা জলখাবার খেয়ে তিনি বিদায় নিলেন। সেখান থেকে সিএম টিটাগড়ে শ্রমিক এলাকায় গেছেন। দ্বিতীয় মাস্টারমশাই জানতে পেরেছেন প্রথম জনের বিদায় সম্বর্ধনা হচ্ছে। প্রথম মাস্টার মশাই তার ভাষণে সিএম এর সঙ্গে দেখা এবং তাঁকে উৎসাহ দেবার সমস্ত ঘটনাটা সবাইকে বললেন। ভীড়ের মধ্যে দ্বিতীয়জনও ছিলেন। শুনে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হল। তিনি সরোজদার মাধ্যমেই সিএম-এর সঙ্গে পরিচয় করেন, তাই সরোজদাকে খুঁজে খুঁজে তার কাছে গিয়ে রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। সরোজদা তখন শ্যামবাজারে বোনের বাড়ীতে এসেছেন। সেখানে গিয়েই দ্বিতীয়জন শুরু করলেন তাঁর চার্জ।'

—'এ কি রকম ধরণের ডাবল স্টাণ্ডার্ড চারুবাবুর? আমি তাকে বললাম আমি গ্রামে যাবার জন্য প্রস্তুত, আমাকে পার্টির কাজে গ্রামে পাঠান হোক। চারুবাবু আমাকে পরিস্কার ঠাণ্ডা জল ছিটোলেন। অথচ দেখুন, নরেনবাবু যখন চারুবাবুর কাছে গিয়ে একই দাবী রাখলেন, ওনাকে কিন্তু তিনি জড়িয়ে ধরলেন। ছিঃ ছিঃ, এটা আমি তাঁর মত নেতার কাছে

আশাও করিনি। দুজন মানুষকে দুধরণের আচরণ!' সরোজদা অবিচল জবাব দিলেন—'হ্যা, তাতে কি হয়েছে? সিএম ঠিকই বলেছেন আপনাকে। নরেনবাবু চাকরী ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছেন। গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মধ্যে কাজ করার সিদ্ধান্তও তিনি নিজেই নিয়েছেন। আপনি কিন্তু নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন নি। সিএম বললে তবে আপনি গ্রামে যাবেন। সিএম কেন আপনার নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন? তিনি এবং আর সব কমরেডরা তো নিজেদের জীবন দিয়ে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হও। এ সিদ্ধান্ত আমাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের সিদ্ধান্ত আপনার উপর চাপিয়ে দিই আর আপনার গিন্নি ঝাঁটা নিয়ে এসে আমাদের তাড়া করুন আর কি?' আসল কথাটা তখন দ্বিতীয় মাস্টার মশাই সরোজদার কাছে স্বীকার করলেন—'সত্যিই উনি কি করে বুঝলেন বলুন তো আমার মনের কথাটা? অবশ্য তখন আমার যা মানসিক অবস্থা, ঝোঁকের মাথায় হয়ত চাকরী ছেড়ে চলেও যেতে পারতাম, কিন্তু কতদিন থাকতে পারতাম বলতে পারছি না। যাক্ বাইরে রেগে গেলেও ভেতরে ভেতরে না যাওয়ার জন্য যে খুশি হইনি তা নয়।'

এরকম অদ্ভুত দেখবার চোখ আমি খুব কম লোকের মধ্যে দেখেছি। কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার হবে সেটা তক্ষুনি ঠিক করে ফেলতেন। অর্থাৎ ভীষণ প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। যতদিন বাঁচবো এই ঘটনা আমার মনে থাকবে। এই যে কোন কথার নিগলিতার্থ সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলা অথবা গূঢ় মনঃস্তত্ব চট্ করে বুঝে ফেলা এটা কম নেতারই আছে। তাঁর কাছে পার পাবার রাস্তা ছিল না।

শহরের কমরেডদের মধ্যে যাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন তাঁদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন সিএম। এমন একটা সময়ের কথা বলছি যখন ছাত্র যুবকদের মধ্যে অ্যাকশন বেশি হচ্ছিল না। শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা কমরেডের সংখ্যাও খুব কম। আমি বরানগর মিউনিসি-প্যালিটিতে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছি। তাই সিএম আমাদের প্রতি একটু বেশি নজর রাখতেন, বোধহয় বেশি গুরুত্বও দিতেন। অন্যদিকে যারা অ্যাকশন করত যেমন প্রদীপ-ট্রদীপরা, ওদের সঙ্গে বসার

খুব একটা তাগিদ তিনি অনুভব করতেন না। একদিন যারা শ্রমিক বেল্টে কাজ করছেন এরকম আমাদের একটা গ্রুপের সঙ্গে তিনি আধ-ঘণ্টা বৈঠক করলেন। সিএম বৈঠকের প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন—'শ্রমিকদের মধ্যে আপনাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা বলুন।' তখনও তিনি 'শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পার্টির কাজ' প্রবন্ধটা লেখেন নি।

আমাদের মধ্যে দিবাকর নামে একটি ছেলে ছিল। ওটা ছিল তার টেক্ নাম। সে হঠাৎ বলে উঠল,

—আমি যে কারখানায় কাজ করছি সেখানে মজুরদের কোন শ্রমিক চরিত্রই নেই।

সিএম কথাটা শুনে থমকে গেলেন, মনে হল কথাটা মনঃপুত হল না।

—কি দেখে বুঝলেন?

—কমরেড সিএম, এরা কাজে এত ফাঁকি দেয়। যে কোনওদিন আপনি কারখানার শপফ্লোরে গিয়ে নিজে দেখে আসুন। কারুরও টিকি পাবেন না। কেউ চা বিড়ি খাচ্ছে, কেউ সিনেমা দেখতে গেছে, কেউ ভাটি-খানায় গুলতানি করছে। কেউবা বাড়ি চলে গেছে। দেখা পাওয়াই মুশকিল, মানে সব লুম্পেন চরিত্র।

সিএম অমনোযোগী উত্তর দিলেন—তারপর?

—এই জন্য পার্টির এই কাজে আগ্রহ পাচ্ছি না। অন্য জায়গায় আপনি যদি পার্টির কাজ দেন তাহলে ভাল হয়।

সিএম সবার দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনারা কেউ কিছু বলবেন?' হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কি ছাত্র?' কতই বা বয়স হবে তখন আমার। বড় জোর কুড়ি-বাইশ। জবাব দিলাম—'না কমরেড, চাকরী করছিলাম তাও ছেড়ে দিয়েছি।' সিএম দিবাকরের দিকে আবার তাকিয়ে মৃদুস্বরে অথচ কঠিনভাবে বললেন—'কমরেড, আপনার কথা আমি শুনলাম। আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। একজন শ্রমিক যদি পেচ্ছাপ করার নামে পাঁচ মিনিট কাজে ফাঁকি দেয় তাহলেও সে অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য শ্রেণী সংগ্রাম করল বলে আমি মনে করি।'

—কমরেড আমি বুঝতে পারলাম না একটু ব্যাখ্যা করুন। দিলীপ বলে ওঠে।

—প্রথমে ভাবতে হবে, শ্রমিক কার জন্য খাটছে। মুনাফা কোথা থেকে আসে, কিভাবে হয়, কিরকমভাবে বন্টন হয়—না বুঝলে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা এবং শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলা যাবে না। সে উৎপাদন করছে মালিকের জন্য,পুঁজিপতির জন্য। তার বেগারীর উপর দাঁড়িয়ে মালিকের মুনাফা। এই অবস্থায় মালিকের স্বার্থ হল কত কম মজুরী দিয়ে শ্রমিককে বেশি খাটিয়ে নিতে পারে। আর অন্যদিকে শ্রমিক ভাবে কত কম খেটে, গতর কম ব্যবহার করে সে তার মজুরী পেতে পারে। আমি যদি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করি তাহলে তাকে পরামর্শ দেব কি করে সে পাঁচ মিনিট কাজে ফাঁকি দিতে পারে। আমার মনে হয় আমাদের কমরেডদের এই দৃষ্টিভঙ্গীটা আয়ত্ব করতে হবে আরও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে।' বেশি সময় ছিল না সিএম'এর। যাবার সময় দিলীপ ব্যানার্জিকে বললেন—'রাজনৈতিক ক্লাস আরও বেশি করে নাও। নতুন নতুন কমরেডদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিপুল সমস্যা থাকছে।' তখন আমার বয়স কতই বা। আর রাজনীতিও কত কম বুঝতাম। কিন্তু এত কঠিন কথা কত সহজে কত অনায়াসে বুঝিয়ে গেলেন সিএম তা আজও ভুলতে পারব না। মার্কস-বাদের অ-আ-ক-খ শিখিয়ে দিলেন কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে যা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

উপরের যে দুটো ঘটনার কথা বললাম তার মধ্যে একটা পদ্ধতির দিক আরেকটা আউট-লুকের দিক। অনেকে সিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন তিনি অন্যদের দাস বানিয়ে রেখেছিলেন। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ঘটনা দুটি থেকেই বোঝা যায় সিএম কত বেশি গণতন্ত্রকে মূল্য দিতেন। কারুর বক্তব্যে যদি তিনি কোন অংশ ভুল বলে মনে করতেন সেটা কঠোরভাবেই রাখতেন অন্যে কি মনে করল তার পরোয়া না করে। দিবাকরের কথায় তাকে ভীষণ উত্তেজিত হতে দেখেছি, তার কারণ বোধহয় তিনি কমরেডের কাছে বুর্জোয়াদের যুক্তি আশা করেন নি। অনেকদিন পরে নিজে নিজেই বুঝেছি দিবাকরের কথা তাঁর বেসিক মূল্যবোধে আঘাত করেছিল যার কারণে

তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন। এমনি কোন যুক্তিতর্কে সহজে তাকে রেগে যেতে দেখিনি।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা ঘটনা! কারখানায় কাজ করতেন যেসব পার্টি কমরেডরা, সিএম তাদের প্রত্যেকের নাম মনে রাখতেন। আমি তখন এভারেডি ব্যাটারী কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছি। আমাদের সঙ্গে সিএম-এর একটা গ্রুপ বৈঠক ছিল। সিএম সেবারও দেখেছি আমার নাম মনে রেখেছেন, তাতে মনে হল আমাদের বেশ গুরুত্বই দিচ্ছেন তিনি। আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলেন। উনি মনে করতেন আমরাই আগে ডিক্লাসড্ হব। একজন সংগঠককে উনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি কর?

—আমি এভারেডি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করি কিন্তু নিজে শ্রমিক নই।

—তুমি তো কারখানায় কাজ কর না, তাহলে শ্রমিকদের সঙ্গে কোথায় কথা বল?

—ওদের সঙ্গে গেটে কথা বলি, কখনও কখনও শপেও কথা বলি। কায়দা করে ভেতরে ঢুকি।

—কখন কথা বল?

—টিফিনের সময় অথবা গেট মিটিংএ।

—শ্রমিকরা তোমাদের তাদের বাড়িতে যেতে বলে না?

—না এখনও বলে নি।

—তোমরা বল না, যে চলুন আপনাদের বাড়ি যাই?

—না সেরকম এখনও বলে নি।

—আমার মনে হয় কমরেড, যেহেতু তুমি কারখানায়, কাজ কর না প্রাথমিক আলাপ হয়ত কারখানাতেই হবে, এভাবেই হয়। কিন্তু তারা যতক্ষণ না তাদের বাড়িতে যেতে বলছে, মনে রাখবে, ততক্ষণ তারা তোমাদের বিশ্বাস করছে না। আমার মনে হয়, ওদের বাড়িতে যাওয়া উচিত। আমাদের মিটিংএ একটি এঁচোড়ে পাকা ছেলে ছিল, সে পরে পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। সে সিএমকে বেশ কড়া সুরে উদ্ধতভাবে বলল,

—আপনি যত সহজে বললেন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কাজটা

তো আমাদেরই করতে হয়। ওদের সঙ্গে দশ মিনিট গেটে দাঁড়িয়ে কথা হয়ত বলা যায়। বাড়িতে গেলেও কথাবার্তাই হয়ত শুনতে চাইবে না। বাড়িতে ফিরে ওরা হয়ত গাঁজার পুরিয়া অথবা চোলাইয়ের বোতল নিয়ে বসবে।

সিএম তখন অবিসংবাদী শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাঁর মুখের উপর এমনি কথা শুনে আমরা তো চমকে গেলাম। সিএম কিন্তু এতটুকু রাগলেন না। বুঝতে পারলেন ছেলেটি বাচ্চা ছেলে. মধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছে, শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা নেই। হাসতে হাসতে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সি এম বললেন,

—কমরেড, আমি আমার উপলব্ধি থেকে বললাম। আপনি যেভাবে বোঝেন সেভাবেই করুন না। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে জানব, শিখব।

এর চার-পাঁচ মাস পরের ঘটনা। বস্তুতঃ আরও দু-একজন কমরেড ঐ ছেলেটির মতই ধারণা পোষণ করত। শ্রমিকরা ফ্যাক্টরিতেই কথা বলতে চায় না বাড়ি তো কোন ছার। কিন্তু এই কয়েকমাসের অভিজ্ঞতায় তারা বুঝতে পেরেছিল সিএম কত সঠিক। আস্তে আস্তে আমরা শ্রমিকদের পাড়াতে, বস্তীতে যেতে শুরু করি। পরিবারের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করি। সেই ঘটনায় সিএমকে দেখেছিলাম দুদিনের একটা চ্যাংড়া ছেলেকে শেখার মত বিনয় নিয়ে এমন উত্তর দিলেন যাতে কাজ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যভাবে বললে অর্থাৎ হুকুমের মনোভাব রাখলে ওরা হয়ত কারখানার গেটেই যেতনা। আমরা অনেক সময় চেতনার স্তর না বুঝেই অনেকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলি। সিএম-এর এই ব্যবহার আমাদের কাছে শেখার মত। নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার বিরোধী ছিলেন তিনি।

অথচ এই সিএম-ই শুনেছি পার্টি শৃঙ্খলার ব্যাপারে ভীষণ কড়াহাতে ডিল করতেন। তখন এম-এল পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি হয়েছে। অর্থাৎ পুরোপুরি পার্টির বিভিন্ন স্তরগুলি নির্বাচিত হয়নি। যাদবপুর অঞ্চলের লোকাল কমিটি সম্পাদক ছিল কার্তিক। গড়ফা অঞ্চলে অনেকেরই ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সত্তরে শহীদ হয়েছেন আশু মজুমদার, তাঁরও অভিযোগ ছিল কার্তিকের বিরুদ্ধে, আমলাতান্ত্রিকতার।

স্থানীয় স্তরে নেতৃত্বদায়ী নেতাদের মধ্যে অনেকেই সিপিএম থেকে আসা। তখন পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি চলছিল। সিএম একের পর পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে লোকাল কমিটিগুলির সঙ্গে বসছেন। যাদবপুর লোকাল কমিটির সঙ্গে বৈঠকে কিছু কমরেড বললেন—'কমরেড সিএম, আমাদের সেক্রেটারী কার্তিক সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ আছে যেগুলি ওর সামনে বলা যাবে না। আমরা আলাদা বসতে চাই আপনার সঙ্গে। ওকে সেক্রেটারী মেনে নিয়ে আমাদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব।' সিএম একথা শুনে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন—'কমরেড কার্তিকের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাক উনি হলেন যাদবপুর লোকাল কমিটির সেক্রেটারী। তাঁকে মেনে নিয়েই আপনাদের কাজ করতে হবে। যদি পার্টিকে আপনারা বিপ্লবী বলে মনে করেন অবশ্যই ভুলচুকের সমালোচনা করবেন কিন্তু পার্টি নেতৃত্ব মানব কি মানব না এটা হল মৌলিক প্রশ্ন। এটা হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার প্রশ্ন। যদি আপনাদের সম্পাদককে বদলাতে হয় তাহলে স্থানীয় সম্মেলনে আপনারা সিদ্ধান্ত নিন। এখন আপনাদের কোন সমালোচনা শুনতে চাই না। কে নেতা হবে বা না হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব পার্টি আপনাদের এখন দেয়নি। প্রয়োজনবোধে কংগ্রেসের আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পরে আমরা জেনেছি যে কার্তিক সম্বন্ধে অভিযোগগুলি ছিল সঠিক। সিএম জেলাস্তরের নেতৃত্বের কাছে কার্তিককে সরাতে বলেন অথচ লোকাল স্তরে অন্য কথা বলেছিলেন। এখানে তাঁর স্পিরিটটা ছিল সর্বহারা পার্টির শৃংখলা রক্ষা। এবং সেই ডিসিপ্লিন হল পার্টি ঐক্যের খাতিরে মতটা চাপিয়ে দিতে হবে। আমার ধারণা, লেলিন স্তালিন মাও সবাই শৃংখলার প্রশ্ন এরকমই কঠোর ছিলেন।

কমরেড সিএম-এর দৃষ্টিভঙ্গীটা গ্রহণ করাই হল আজকের দিনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সিএম-ই প্রথম নেতা যিনি দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্বে উন্নীত করার কথা বললেন। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষককে নেতৃত্বে উন্নীত না করতে পারলে যত বড় বিপ্লবী সম্ভাবনাই থাকুক না কেন শ্রেণী সংগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই সব কৃষকদের স্কোয়াডকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিলেই তাদের বিপ্লবী

উদ্যোগ বাড়বে। এই অধিকার দিতে বাধা দেয় আমাদের মধ্যে সংশোধনী চিন্তাধারা। ক্ষমতা দখলের রাজনীতিই পারে তাদের চিন্তাজগতে আলোড়ন আনতে। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে বিপ্লবী কমিটি প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক জনতাকে সংগ্রামে সামিল করা—এই দুটি কাজ সফলভাবে করতে পারলে ঘাঁটি এলাকা গড়ার সমস্যার সমাধান হবে। মধ্য কৃষককে ধনী কৃষকের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক। এছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। গ্রামাঞ্চলে সমস্ত শ্রেণীগুলিকে নির্মূল করার অভিযান পরিচালনা করা যায় একমাত্র গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে কৃষক রাজ কায়েম করে। গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতির সংগ্রাম অন্য কোন শ্রেণী পরিচালনা করতে পারে না। কারণ দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যেই সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্রতম ঘৃণা সঞ্চিত রয়েছে যুগ যুগ ধরে। এই ঘৃণা সংগ্রামে অবিচলতা আনে। পারে বিপ্লবী জোয়ারকে সৃষ্টি করতে। কারণ, বিপ্লব মূলত তাদের স্বার্থকেই বহন করে। ভারতের বিপ্লবে সিএম-এর এই বিশ্লেষণ গোটা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ ধরে প্রাসঙ্গিক থাকবে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সিএম তাঁর লেখায় এবং কাজে সব সময় যে দিককে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন তা হল এই যে মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার আলোয় আমাদের দেশে অনুশীলনের এবং প্রয়োগের স্তরকে উন্নত করতে হবে। নকশালবাড়িতে ভারতে মাও-চিন্তাধারার প্রথম প্রয়োগ হল। আর সংশোধনবাদীদের সঙ্গে তিনটি প্রশ্নে পার্থক্যের কথা তিনি সুচিহ্নিত করলেন। প্রথমতঃ গণতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম অর্থাৎ জনযুদ্ধের মারফতই সফল হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই জনযুদ্ধে কেন্দ্র ও প্রধান শক্তি হচ্ছে গ্রাম ও কৃষকশ্রেণী। জনযুদ্ধ হল কৃষকযুদ্ধ। তৃতীয়তঃ জনযুদ্ধের বিজয় হতে পারে একমাত্র মাও চিন্তাধারায়। গেরিলাবাহিনী গঠন করে শ্রেণীশত্রুকে ধ্বংস করার পথেই একমাত্র সংগ্রামের জোয়ার দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলতে পারে। সংশোধনবাদী চিন্তাধারা শত্রুর শক্তিকে বড় করে দেখায় আর অন্যদিকে জনযুদ্ধ জনগণের শক্তিকে বড়

করে দেখাতে উদ্বুদ্ধ করে এবং শত্রুকে ঘৃণা করতে শেখায়। লিন পিয়াও 'জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবি হোক' গ্রন্থে যে পদ্ধতি ও নীতির কথা বলেছেন তা-ই হোল মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার সঠিক প্রয়োগ ও সারা দুনিয়ার বর্তমান যুগের অভিজ্ঞতার সার-সঙ্কলন। শ্রেণীবিশ্লেষণ, শ্রেণী-সংগ্রাম, অনুসন্ধান ও অনুশীলন এই চারটে হাতিয়ারকে সফল প্রয়োগ করতে পারলে তবেই কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা গড়ে তোলা যাবে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে কম্‌ সিএম একটা নতুন দিক নির্দেশ করলেন। আজকের ভারতে রাজীব গান্ধী, বুটা সিং, ভিপি সিং থেকে জ্যোতি বসু সবাই জাতীয় সংহতির ফেরিওয়ালা। সিএম কুড়ি বছর আগেই বললেন, বর্তমান শাসকশ্রেণীর জাতীয় ঐক্যের আওয়াজের মূলে লক্ষ্য একটাই, তা হল একচেটে পুঁজির শোষণের ঐক্য। সুতরাং এই ঐক্যের আওয়াজ প্রতিক্রিয়াশীল। মার্কসবাদীদের এই আওয়াজের বিরোধিতা করতে হবে। প্রতিটি জাতিসত্বার আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারকে স্বীকার করতে হবে। সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই ভারতের নতুন ঐক্যের চেতনা আসবে। নাগা, মিজো, কাশ্মীর ইত্যাদি এলাকায় পেটিবুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সংগ্রামে যুক্তফ্রন্ট করে শ্রমিকশ্রেণীকে এগোবার কথা তখনই তিনি বলেছিলেন। এই মৈত্রীর পূর্বশর্ত হল সশস্ত্র সংগ্রাম এবং ভিত্তি হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। শেষ লেখায় সিএম বললেন, রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ পার্টি আমরা যদি গঠন করতে পারি তবেই আমরা পারব ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে এবং সংগ্রামকে আরও উন্নত পর্যায়ে তুলতে। এবং শহীদ হবার আগের লেখায় এই বিশ্বাস রেখেছিলেন যে সে কাজটা অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা করতে পারবেন। পার্টিকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন।

সিএমকে আমি মোটেই মেডইজি হিসেবে দেখিনা। সিএম-এর আউটলুক ও পদ্ধতিই আমার কাছে প্রধান। তা দিয়ে নতুন নতুন সমস্যাকে আমরা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব। চীনে সংশোধনবাদ ক্ষমতা দখল করে নেবার পর যদি সিএম'এর রচনাবলীর প্রাসঙ্গিক অংশ

পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে বিশ্লেষণটাই পাল্টে যাচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল আন্তর্জাতিকতার মতাদর্শ এবং যা প্রাসঙ্গিক তা'হল তাঁর দুর্দমনীয় স্পিরিট।

ভাস্করের কথা

আমার বাবা ১৯৬৫'র শেষে পাকিস্থান থেকে এসে সেট্‌ল্ করলেন জলপাইগুড়িতে। ডাক্তারী করতেন। আমিও আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে রাজনীতিই করব ঠিক করলাম। তাই চাকরি নিই নি। আমার অ্যামেরিকান স্ত্রী একটা চাকরি পেয়েছিলেন। সেই সময় সিপিআই-এম-এর বিক্ষুব্ধ দুজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে বাইরে থেকে যা ধারণা হয়েছিল তা হল, আন্তর্জাতিক ও জনযুদ্ধের প্রশ্নে সিপিআই-এমই মাওবাদী পার্টি। এমনকি পার্টি সদস্য হব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম এই পার্টি জনযুদ্ধের লাইন থেকে শত-সহস্র যোজন দূরে। কিন্তু এটাও বুঝলাম যে নিশ্চয়ই এই প্রশ্নে পার্টিতে বিক্ষুব্ধ অংশও আছে। যাই হোক, সেই সূত্রেই জানলাম উত্তর বাংলায় জনযুদ্ধের লাইন ও তত্ত্ব অনুশীলন করছেন চারু মজুমদার। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে তিনি কৃষকদের মধ্যে লেগে পড়ে থেকে কাজ করছেন। আমার বয়স তখন বছর সাতাশ। আমি জলপাইগুড়ি চলে যাই। তার আগে কলকাতায় তখন আমার আমেরিকান স্ত্রীকে নিয়ে সন্দেহের জলঘোলা করে পার্টির একজন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে পারিবারিক একটা যোগসূত্র থাকার ফলে কলকাতা জেলা কমিটিতে ভালই সংযোগ ছিল। একজন বিক্ষুব্ধ জেলা কমিটি মেম্বার ছিলেন, তিনিই আমাকে ডিসিডেন্ট সার্কেলে যোগাযোগ করিয়ে দেন। আমি ঠিক করলাম গিয়েই আমি চারু মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করব না।

আমি নিজের লাইন ও কন্‌ট্যাক্ট গড়ে তুলব, এটা ভেবেই জলপাইগুড়ি গেলাম। ভাবলাম, রাজনৈতিক লাইন যদি ঠিক থাকে

তাহলে নির্ঘাত সিএম'এর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। আমি তখন যুব-ছাত্রদের মধ্যে কাজ করা শুরু করি। এদের মধ্যে অনেকেই আবার চারুদার ফলোয়ার ছিল। ১৯৬৬-র অক্টোবর/নভেম্বর মাসে খাদ্য আন্দোলনের সময় এদের মধ্যে একজন আমায় এসে বলল, শিলিগুড়িতে যেতে হবে সিএম তোমার সঙ্গে কথা বলবে। ছেলেটি চারুদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। খুব অসুস্থ ছিলেন তা সত্ত্বেও পাইপ টানছিলেন। তামাকের গন্ধেই বুঝতে পারছিলাম এত বাজে কোয়ালিটির তামাক খেলে ক্যান্সার অনিবার্য। চারুদা বসেছিলেন কাঠের ফ্রেমের একটা ইজিচেয়ারে। চেয়ারটার বার্নিশ উঠে গেছে। কাঠের প্ল্যাংকিংএর ঘর। দুটো বিছানা একটা বড় আর একটা ছোট। খুব সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হল। লীলাদি বললেন—যত তাড়াতাড়ি ওনার সঙ্গে কথা বলে আপনি চলে যান। আমরা রিপোর্ট পেয়েছি জলপাইগুড়িতে আপনারা ভাল কাজ করছেন। সৃজনশীল কাজ করছেন আপনারা।

আমরা তখন জলপাইগুড়িতে প্রাধান্যকারী শক্তি। দেয়াল লেখার জন্য আমরা একটা কালি বানিয়েছিলাম যা পীচে বা দেয়ালে বৃষ্টি হলেও ধুয়ে যেত না, জলজল করে উঠত। লাক্ষা দিয়ে ট্রিট করতাম রঙটা। চারুদা সেটার প্রশংসা করেন। বারবার সৃজনশীলতার কথা উল্লেখ করতেন এবং সাংঘাতিক জোর দিতেন ইনোভেশনের উপর। 'রুশ বিপ্লব হয়ে গেল পঞ্চাশ বছর অথচ সাহিত্য, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিতে কোনও নতুন ধারা নেই। এটা কি ধরণের সমাজতন্ত্র?' যতটুকু কথা হল তাতে এই দিকটা বারবার তুলে ধরছিলেন।—'তোমরা কাজ করতে থাক যুবছাত্রদের মধ্যে। আমরা কৃষক আন্দোলন নতুন ধারায় গড়ে তুলছি। এটা ম্যাচিওর করলে নতুন কর্মী পাব। তুমি জলপাইগুড়ি কুচবিহার অঞ্চল থেকে মেসেজ নিয়ে আমার কাছে আসবে মাসে তিনচার বার। কাজ না থাকলে এমনিই এসে গল্প কোর।'

নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন তখন গড়ে উঠছে। সে সময়টা আমি চারুদার কাছে মাঝে মাঝেই যেতাম। তখন আমার কাজ ছিল দলিলপত্র অনুবাদ করা, চিঠি দিয়ে আসা কিংবা নিয়ে আসা। গ্রামের

এলাকার স্ট্রাগলের খবর চারুদার কাছে নিয়ে আসা। তখন জলপাই-গুড়ি অঞ্চলে সি. পি. আই. এম-এর মধ্যে একটা শ্যাডো কমিটি ছিল। অনিল মুখার্জী তখন মহকুমা কমিটির সেক্রেটারী। সেই ১৯৬৭ সালেই শ্যাডো কমিটিটা ঠিক পার্টির মত ফাংশন করত। বলা চলে চারুদাই ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটি। আমরা একটা সুসংগঠিত শৃংখলার মধ্যে কাজ করতাম। এভাবেই তখন কাজ করেছি। এমন কোন বিষয় ছিল না যা আমরা আলোচনা করতাম না। কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমি দেখেছি বরাবর একটা সেট্ প্যাটার্ণ ছিল আলোচনার। চারুদার সঙ্গে আলোচনায় সেই টাইপটা ভেঙ্গে যেত। আমি বিশ্ববন্দিত অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছি। বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। কমিউনিস্ট পার্টিতে চারুদার মত এত বড় মাপের মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তিনি ক্যালিবারের দিক থেকে যেকোন বিশ্ব-নেতার সমকক্ষ ছিলেন। আমাদের মধ্যে আলোচনা হত সাহিত্য, রাজনীতি, সঙ্গীত যেকোনও বিষয়ে। আমি একবার চারুদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

—আপনি সার্ত পড়েছেন ? সার্তকে তো চীনেরা শোধনবাদী বলছেন। আপনি কি বলেন ?

—একটাই মাত্র নাটক পড়েছি। প্রিজনার অফ অ্যালটোনা। খুব একটা ভালো লাগেনি। তবে তাঁর স্ত্রী সিমন গু ব্যভোয়ার-এর ম্যাণ্ডারিনস্ পড়েছি। ফ্রান্সের সম্বন্ধে সলিড ইনফরমেশন পাওয়া যায়। আমাদের বুঝতে হবে এঁরা কেন পৃথিবীর দিকে দিকে সশস্ত্র লড়াইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ?

এরপর আমি তাঁকে ব্যভোয়ার 'সেকেণ্ড সেক্স' পড়াই যাতে ব্যভোয়ার নারীদের পুরুষের কাছে অধীন অবস্থার জন্য জৈবিক কারণকে উল্লেখ করেছেন। চারুদা খুব উৎসাহ নিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অধীনতার কারণ যে জৈবিক এটা তিনি মানতে চান নি। এরপর আমি তাঁকে সার্ত-এর 'বিইং এণ্ড নাথিংনেস' পড়তে দিই। চারুদা একেবারে গোগ্রাসে বই শেষ করে ফেলতেন। একগাদা বই শেষ করতেন অতি দ্রুত। ইংরাজীতে যাকে বলে 'ডিভাওর' করা। লীলাদি ঘরবাড়ির বিভিন্ন

কাজ দেখাশুনো করতেন, সামলাতেন। রোজকার হাটবাজার রান্না ঘর কন্না। আর চারুদা রাজনীতি। চারুদার সঙ্গে জগতের যে কোন বিষয় নিয়ে যুক্তিসম্মত আলোচনা চালান যেত। এরকম ইতিহাস সচেতন, ডাইনামিক মানুষ আমি বড় একটা দেখিনি আমার জীবনে।

সঙ্গীত আমার খানিকটা বলতে পারেন অবসেশনের মত ছিল। পাশ্চাত্য সঙ্গীত মোটামুটি বুঝতাম। কিন্তু ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত বুঝতাম না। আমার দৃষ্টিভঙ্গীও গভীর ছিল না। চারুদা ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত অত্যন্ত ভালো বুঝতেন। স্ট্রাকচার বা কাঠামো চট্ করে ধরতে পারতেন। হারমনি'র ডেপ্‌থ বা স্বরসমন্বয় যাকে ইংরাজীতে কনসোনেন্স বলে তা অদ্ভুত বুঝতেন। আমাকে বলতেন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের প্যাটার্নটা হল রেখাকার বা লিনিয়ার। অপূর্ণ থেকে সম্পূর্ণ সাউণ্ডের উত্তরণ। আমি বলতাম, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে একদিকে স্বর-সমন্বয় অর্থাৎ কনসোনেন্স, অন্যদিকে এর বিপরীত অর্থাৎ ডেসোনেন্স, তুটোই বিকশিত করা যায়। এবং যার মাধ্যমে এটা করা যায় তা হল সোনাটা ফর্ম। চারুদা শুনে বললেন, 'আমাকে বুঝিয়ে দাও।' আমি টেপ নিয়ে যেতাম, ওনাকে শোনাতাম। উনি, আশ্চর্য ব্যাপার, তু-তিন মাসের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর কোন কষ্টই হল না। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। একদিন বাকের একটা সিম্ফণী বাজিয়ে শোনাচ্ছি। তিন-চারটে মেলোডি খেলছে, নীচের মেলোডির তাৎপর্য হয়ত আমি ধরতেই পারছি না, চারুদা ধরিয়ে দিলেন এবং গোটা হারমনির মধ্যে নীচের মেলোডির কি সম্পর্ক ধরিয়ে দিলেন। এমনিভাবে মোজার্ট শুনেছি একসঙ্গে। বিটোফেনের রেড কোয়ার্টেটস বা হাইডেনার কোয়ার্টেটস। উনি আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত করেছেন। আর কি অসাধারণ সেসব প্রশ্ন। অথচ এত বছরের জীবনে প্রথম শুনছেন এই ধরণের সঙ্গীত। এমনি ছিল তাঁর প্রতিভা।

চারুদা আমাকে একদিন বললেন, 'তুমি তো অ্যামেরিকান সাহিত্য অনেক পড়েছো, আমাকে পড়াও দেখি। আমি অ্যামেরিকান সাহিত্য কিছু বুঝি না।' আমি চারুদাকে বললাম—'আমাদের অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত কমিউনিস্টদের ইয়াঙ্কী কথাটাতে বেজায় আপত্তি ও ঘৃণা। অ্যামেরিকান

মানেই ইয়াঙ্কী নয়। মেফেয়ার থেকে যেসব পুরোন সেটলার্সরা এসেছিল তাদের অবস্থা মার্কিন সমাজে অত্যন্ত খারাপ। বস্তুতঃ তাদের বিপরীতটাই হল মার্কিন সংস্কৃতি। এদের মধ্যে তবু প্রাচীন লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাটা রয়েছে। অথচ খারাপ অর্থে আমরা ইয়াঙ্কী কথাটি ব্যবহার করি।' চারুদা মনে হল আমার কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলেন—'তুমি আমাকে অ্যামেরিকান সমাজ সম্বন্ধে বই পড়িও তো।' এরপর আমরা সিনক্লেয়ার লুইস-এর প্রায় সব বই পড়লাম। অ্যামেরিকান বাস্তবতার উপন্যাসে থিয়োডোর ড্রাইসেনের লেখা পড়লাম। কমিউনিস্ট মুভমেন্টের ওপর আপট্রন সিনক্লেয়ারের বই পড়লাম। এসব ১৯৬৬ সালের কথা। তাঁকে অবশ্য উইলিয়াম ফকনার পড়াতে পারিনি। সময় হল না।

এরপর চারুদা ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কার্ডিয়াক অ্যাজমা। যখন টান উঠত ভয়াবহ অবস্থা হত তাঁর, চোখে দেখা যায় না এত কষ্ট। সেসময় ওষুধ অত্যন্ত বেশি খেতে হত চারুদাকে। ওভার মেডিকেশন চলত। বড় বেশি পেনকিলার খেতেন। আমার মনে হয় এগুলিই একটা সময় তাঁর আউটলুকে মৌলিক পরিবর্তন আনে। এই সময় আমি চারুদার কথায় তাঁকে জোগাড় করে দিয়েছিলাম জ্যাক বেল্ডেনের চায়না শেকস্। পেথিড্রিন খেতে হত অনেকগুলি এবং লাগাতার। আর যখনই ওষুধ খেতেন, ভীষণ আবেগপ্রবন হয়ে পড়তেন। কোন কথা বলতে বলতে যদি ইমোশনাল হয়ে পড়তেন তাহলে চোখের জল সামলাতে পারতেন না। ১৯৬৮ থেকে চারুদার মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করল। মাও-সে-তুঙকে সমালোচনাহীন গ্রহণ ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর রকমের একটা ডগমায় পরিণত হয়ে গেল। এরপর অবশ্য তিনি কাজেও অসম্ভব রকমের ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

১৯৬৭ সালের শেষের দিকের একটা ঘটনা। আমি তখন একটা আদিবাসী এলাকায় গ্রামে কাজ করছি। একটা সংঘর্ষে আমি তখন আহত। আমাদের যারা মার্ডার করতে এসেছিল তারা আমাদেরই উপর চার্জ দিল। চারুদা আমায় একদিন ডেকে পাঠালেন। ওর বাড়িতে গিয়ে দেখি লম্বা-চওড়া বড়-সড় একটা লোক চারুদা যা বলছেন তাতেই

মাথা নাড়ছে ভক্তের মত। আমি চারুদার কাছে বন্ধুর মত ছিলাম। আমাদের কথাবার্তা হত সমানে সমানে। চারুদা ইশারায় আমাকে বাইরে আসতে বললেন—'এর নাম মহাদেব মুখার্জী, নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামকে সমর্থন করে। আসানসোল এলাকার উদ্বাস্তু নেতা। দুদিন আমার এখানে আছে, মাথায় কিছুই নেই। কিছুই ঢোকাতে পারছি না। আমি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠিনি। দেখতো তুমি ওর সঙ্গে আলোচনা করে ওকে কিছু বোঝাতে পার কি না।' চারুদার কথায় আমি মহাদেববাবুর সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করি। ওর মধ্যে কোন ক্রিটিকাল ফ্যাকাল্টিই ছিল না। তখন সবাই চারুদার কাছে তীর্থ করতে যেত।

১৯৬৮-র গোড়ার দিকে পার্টি জীবনে একটা বিপর্যয় আসে। পার্টি খ্যাডো কমিটির সেক্রেটারী অনিল মুখার্জী ও তার চেলা সুজিত বোস ছিল সি. পি. এম জেলা কমিটির সদস্য। এরা ধোঁয়াটে সশস্ত্র সংগ্রাম ও ক্ষমতা দখলের কথা বলত যেটা ছিল মোটা দাগের। কোন রাজনৈতিক লাইনও ছিল না। আমরা যারা নতুন কথা বলতাম তাদের কাছে ওদের কথা মনঃপুত হত না। ওরা মিটিং ডেকে ১৩ জন কমিটির মধ্যে ৮ জনকে বের করে দেয়। আমি দৌড়ে গিয়ে সিএম-এর কাছে গেলাম। চারুদা বললেন—'তোমরা ৮ জনের কমিটি করে কাজ শুরু কর। সংখ্যালঘুরা তোমাদের বার করে দিয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না।' অন্যদিকে প্রমোদ দাশগুপ্তরা সি.পি.এম-এর তেনালী কনভেনশনে বই বার করে আমাদের সি.আই.এ এজেন্ট বলেছেন। অনিলবাবুরাও এদিকে আমাদের সি.আই.এ এজেন্ট বলেছেন। চারুদা তাই শুনে বললেন—'এটা খুব আনন্দের কথা তোমরা সি.আই.এ-কে বল তারা যেন আরও কিছু লোক আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।'

একদিন চারুদা বিশেষ ক্যুরিয়ার দিয়ে আমাকে গ্রাম থেকে ডেকে পাঠালেন। তখন আমাদের গ্রামে কাজ করার ব্যাপারে বিশেষ কতগুলি নির্দেশ ছিল। পিচ রাস্তা ক্রস করে হাঁটবে না, চায়ের দোকানে বসবে না। শহরে ঢুকে কোন কাজ করবে না। গ্রামের লোকেরা যাতে তোমাদের তাদের লোক বলে মনে করে সেজন্য এটা ছিল প্রয়োজনীয়

ট্রেনিং। কৃষকদের মধ্যে দিনরাত পড়ে থাক। তা নইলে তোমরা ভারতের কৃষককে চিনবে না। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক ছাড়া আর কারোর বাড়ীতে আশ্রয় নেবে না, এটা চারুদা বারবার জোর দিতেন। তিনি বলতেন 'জনগণকে মুভ করাতে হলে প্রথমেই আমাদের জনগণকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হবে। তারা কি ভাবছে, কি চাইছে।' পার্টির সাংগঠনিক ভিত্তি ও গণভিত্তি কিভাবে বাড়তে পারে তার উপর সপ্তম দলিল লিখছেন তিনি তখন। সে সময় আমরা ইলেকট্রিসিটি বোর্ড চা-বাগান ইউনিয়ন এগুলি সব কন্ট্রোল করি। যাই হোক, চারুদার জরুরী তলবে গেলাম শিলিগুড়িতে। —'জরুরী দরকার। তোমাকে আসামে যেতে হবে।' এর আগে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। এন এফ রেলওয়েতে কাজ করে একজন লোক চারুদাকে খবর দিয়েছিল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট নকশালদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেবে। সেখান থেকে তাদের বার্মাতে নিয়ে যাবে। চারুদা আমাকে একটা গ্রুপ নিয়ে যাবার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। —'ব্যাগে হাফ প্যান্ট নিয়ে যাবে। সাধারণ ড্রেসে যাবে। গিয়ে পরিস্থিতি দেখে এস।' আমি তো হাফপ্যান্ট জামা জুতো ব্যাগে পুরে রেডি। সেই লোকটি কিন্তু আর এল না। এ নিয়ে পরে খুব হাসাহাসি হয়েছিল।

যাই হোক, চারুদা আমায় নির্দেশ দিয়েছিলেন আসামে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার। আমি দ্বিধা নিয়ে বলেছিলাম—'ওখানে গিয়ে আমি কি করব? ওদের ভাষা বুঝিনা। সংস্কৃতি কৃষ্টি কিছুই জানি না। আপনি অন্য কাউকে পাঠান।' চারুদার জবাব—'উত্তর পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুমি বুঝতে পারছ না? অরুণাচল, মিজো, নাগা, খাসী এরা সবাই অশান্ত, মুক্তির আকাঙ্খায়। স্ট্রাটেজিক জায়গা এসব। এদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াইতে ঐকবদ্ধ হতে গেলে এদের মধ্যে আমাদের বেস তৈরীর কাজ করতে হবে।'

—কিন্তু অন্ততঃ একটা যোগাযোগ বলবেন তো?

—১৯৪৮-৫০ সময়ে বঙ্গাইগাঁওতে একজন লড়াকু শ্রমিক ছিলেন। ওকে যদি খুঁজে পাও তাহলে ওরই মাধ্যমে এগোও। সেই কমরেডটি ছিলেন যথেষ্ট লড়াকু আর এগিয়ে থাকা।

এটা ১৯৬৮ সালের কথা। সে সময় আমি আসামে চলে যাই। আসামে তখন পার্টি সংগঠন নেই। ভদ্রলোককে খুঁজে বার করি। তিনি ওয়েল্ডারের কাজ করতেন, তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলাম। আমাদের কাজ দ্রুতগতিতে এগোতে লাগল। সেই ভদ্রলোক আজও পার্টির কাজ করেন। ১৯৬৮ শেষে আমাদের পার্টির হোল টাইমার ছিল ২৭৫ জন। একেক জনের কাজের ক্ষেত্র বিশাল বিশাল গ্রাম। অর্থাৎ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আমাদের প্রভাব।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী নাগাদ প্রথম পার্টির মধ্যে গণ্ডগোল বুঝতে পারলাম। তখনও এম-এল পার্টি হয়নি। সে সময় নকশালবাড়ী ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে পবিত্র সেনগুপ্ত, দীপক বিশ্বাস এরা কাজ করত। চূড়ান্ত ধরণের মতান্ধ ছিল এইসব লোক। এদের পদ্ধতি ছিল 'আমাদের মত মানো কি না।' ফর অথবা এগেনস্ট। পার্টিতে তখন দু লাইনের সংগ্রাম চলছে। দেশব্রতী পত্রিকা ছাড়া আর কিছু তখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছোত না। আমি বললাম—'ভাল কথা ডিবেট করা দরকার।' ওদের একজন এসে আমাদের অ্যাটাক করল পেটি বুর্জোয়া তার্কিক বলে। তারপর পকেট থেকে কানু সান্যালের তরাই রিপোর্টের উপর একটা বিরোধী লেখা বার করে আমাকে শোনাল। জানলাম লেখাটি দীপক বিশ্বাসের। অথচ আমি বিরোধীতার জায়গাটাই বুঝতে পারছিলাম না। এই লেখাতে সিএমকে একটা ভগবান হিসাবে দেখান হয়েছিল। সিএমকে মানো অথবা মানো না। অর্থাৎ আমি বুঝলাম যে রাজনীতিকে একটা ট্রিভিয়াল তুচ্ছ জায়গায় এরা নিয়ে এসেছে। কানুবাবুর তরাই রিপোর্ট যাতে নকশালবাড়ি সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সার সংকলন করা হয়েছিল তা বস্তুতঃ মাও-সে-তুঙের হুনান রিপোর্টের অনুকরণ করে লেখা হয়েছিল। এবং বাস্তবে ঘটেছিল তা অনেক বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল, অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল যা এমনকি কানুবাবুর লেখাতেও প্রকাশ পায়নি। তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য আমরা বছর খানেক সময় পেয়েছিলাম। এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী গঠনের সমস্ত সুযোগ ছিল। মনে আছে সে সময় একমাত্র বুড়াগঞ্জ এলাকা থেকেই সাড়ে তিন হাজার লোক

পার্টির হোল টাইমার হতে চাইছিল। দার্জিলিংএর কৃষ্ণভক্ত শর্মার মত নেপালী যুবকরা তখন বিবৃতি দিয়ে শুধু সমর্থনই করে নি। কাজেও পর্যন্ত নেমে পড়েছিল। কিন্তু নকশালবাড়ির বিদ্রোহ থেকে সৈন্য-গঠনের সুযোগটা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। কোন কোন জায়গায় গেরিলাদল গঠন হয়েছিল বটে তবে তা শুধুমাত্র শ্রেণীশত্রু খতমের উদ্দেশ্যে। আমরা চান্সটা পুরো মিস করেছিলাম। ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল আমাদের অনুকূলে। গোটা পাহাড় এলাকা জুড়ে রাজনীতিতে জাগ্রত কৃষক ছিল সশস্ত্র। কানুবাবুর তরাই রিপোর্ট সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা ছিল যে সৈন্যগঠনের সম্ভাবনাকে রিপোর্টে খতিয়েও দেখা হয়নি।

যাই হোক, দীপক বিশ্বাসদের প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করে কোন দলিল দেয়নি। এরা তখন চীন ঘুরে এসেছে বলে পার্টিতে প্রচণ্ড সম্মান ও শ্রদ্ধা কুড়োচ্ছে। চিংকাং পাহাড়ের উপর চীনা কমরেডরা পুরোন যুদ্ধের ধরন বুঝিয়েছে এদের সাত দিন ধরে। ছুটো সৈন্যবাহিনী অর্থাৎ গণমুক্তিফৌজ এবং কুওমিংটাং-এর ড্রেস পরিয়ে তারা যুদ্ধগুলি যা হয়েছিল সেগুলিকেই রিএনাক্ট করে অর্থাৎ অভিনয় করে দেখাল। এতে নিশ্চয়ই ওদের কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবের স্বার্থে তারা একাজ করেছিল। যাতে এখানকার কমিউনিস্টরা যারা কোনদিন সশস্ত্র লড়াইয়ের চূড়ান্ত রূপ অর্থাৎ লাল মুক্তিফৌজ গঠনের তাৎপর্য বোঝেনি, তারা এসব দেখে খানিকটা অনুধাবন করতে পারে ও পরে প্রয়োগ করে। হঠাৎ শিলিগুড়ি থেকে গোয়ালপাড়া এলাকা কমিটিতে এই সময় মেসেজ এল আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে। বয়ানটা ছিল, গোটা রিজিওনাল কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে চার পাঁচ দিন সময় হাতে নিয়ে চলে এস শীগগীর। এই মেসেজ পেয়ে আমরা চলে এলাম। এসে অনেক নতুন নতুন কথা শুনতে পেলাম। চারুদার বাড়ি এলাম। সেখানে সৌরেন বসু ছিলেন যাকে আমরা ভদ্রবাবু বলতাম। তিনি অনেক নতুন তত্ত্ব দিলেন। গণসংগঠন করা, জমি দখল করার আন্দোলন হল সংশোধন-বাদ। গেরিলা দল গঠন করে জোতদার খতম করা হল আশু প্রধান

কাজ। এরকম তিনচারটে খতম করলে একটা মাস আপসার্জ হবে। ভারতে তখন সবজায়গায় যে সমান বিকাশ নয়—এই তত্ত্ব পেছনে চলে গেছে। প্রতিটি এলাকা উত্তপ্ত বারুদ। দেশলাইয়ের কাঠি লাগালেই হয়। নতুন যুগে যে কোনও এলাকাতে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করা যায়। আমাদের বলা হল, তোমরা যা করছ তা হল সংশোধনবাদ।

চারুদা বললেন, 'তোমরা লিখিত রিপোর্ট আমাদের দাও।' আমরা আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মিশ্র অঞ্চল সম্পর্কে পরিচয় দিলাম। তিনি আমার প্রতি একই রকম উষ্ণ ছিলেন—যা ঐ সামান্য সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা তখন পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলার বিপক্ষে ছিলাম। ডেমনেস্ট্রেশনও করেছি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। সেটা আমাদের শোধনবাদী কাজ হয়েছে, এ কথা তিনি বললেন। সেদিনই আমরা পার্টি কংগ্রেসে যে নতুন লাইনটা আসছে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। ভদুবাবু কিছুক্ষণ ছিলেন সিএমএর সামনে। তিনি কর্তৃত্ববাদ বা অথরিটির নতুন তত্ত্ব রাখলেন। ভারতের বিপ্লবে সিএম হলেন অথরিটি। এই নিয়ে ৪দিন আলোচনা হল। আমাদের মধ্যে দুভাগে ভাগ হল কমরেডরা। আমরা ছিলাম সংখ্যালঘু। আমরা ভাবলাম চারুদা যা বললেন তা করব কিন্তু মনে মনে নিরুৎসাহ। আমি অবশ্য চারুদার প্রমাণিত যোগ্যতা সম্বন্ধে তখনও নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। আমার কাছে ছিল লেনিনের 'হোয়াট ইজ টু বি ডান'। বইটা পড়ছিলাম। নিজের মনে সহজ হতে পারছিলাম না। চারুদা আমায় বললেন, 'রিড দ্য রেড বুক এ্যাণ্ড হোয়াট ইজ টু বি ডান।' আমার একটা কথা মনে হল। আগে চারুদা মানব ছিলেন। তারপর এদের পাল্লায় পড়ে হলেন অতিমানব। অতিরিক্ত ওষুধ খাবার ফলে বাস্তবকে বস্তুগত নিয়ম দিয়ে দেখবার নীতি ক্রমশঃ বর্জন করেছিলেন। এর সঙ্গে মিশে গেল কর্তৃত্ববাদ মানার সংস্কৃতি। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়লাম। এই কি সেই চারুদা ? সেই প্রাণচঞ্চল, আবেগে টগবগ করা মানুষটা বদলে গেছে। কি রকম একমাত্রিক, কর্তৃত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী।

আমরা ফিরে গেলাম। কথা হল সবাইকে ডেকে স্কোয়াড বানাব।

এরপর আরও নতুন নতুন লাইন এল। কৃষকই ঠিক করবে কাকে খতম করা হবে। আমরা দেখলাম কৃষকরা খতমের তালিকায় নির্বাচন করে প্রতিবেশিকে যার কাছ থেকে সে হয়ত দু-মণ ধান ধার নিয়েছিল অসময়ে। ফলে, গোটা কৃষক সমাজ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে থাকলাম। আরও এটা বাড়তে লাগল ১৯৬৯-র শেষের দিকে যখন কোন গণমুখী কাজ আমাদের সামনে ছিল না। ভয়ানক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা কাজ চালিয়ে গেছি অনেক কষ্টে। তাই আমাদের বিরাট গণভিতটা ধীরে ধীরে ধ্বসে যেতে লাগল। আগে শয়ে শয়ে জঙ্গী সংগ্রাম হচ্ছিল গ্রামে। খতম লাইন আসার পর শুরু হল নিপীড়ন। ক্রমে ক্রমে গোটা কৃষক সমাজের কাছে আমরা আইসোলেটেড হয়ে গেলাম। এর মধ্যে লাইন এল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা চলবে না। স্থানীয় অস্ত্র যেমন দা, ছুরি, বটি এসব ব্যবহার করতে হবে। আমাদের এলাকায় বড় বড় জোতদার ছিল। তাদের দুর্গের মত বাড়িতে লাইসেন্স ও বিনা লাইসেন্সে রাখা অনেক বন্দুক ছিল। খতমের লাইন শুরু হবার পর সেগুলি আরও বাড়ল সংখ্যায়। প্রতিটি থানায় দশ-বারোটি পুলিস ক্যাম্প বসল। আমাদের অস্ত্র ব্যবহার ক্রমশঃ অপরিহার্য হয়ে উঠল। কৃষকদের সিদ্ধান্ত হল হাণ্ড গ্রিনেড ও পাইপগান ব্যবহার করতে হবে, জোতদারদের মোকাবেলা করতে গেলে। পার্টি কমিটিতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে লাগল। তবে খতমের লাইনটা আমরা ছাড়লাম না। বিষয়টা চারুদাকে জানালাম। রক্তলোলুপ সামন্তপ্রভুদের হাত থেকে এছাড়া বাঁচা যাবে না। এসময় চারুদা কলম ধরলেন, 'এটা হাস্যকর বিচ্যুতি বলে'। সিএম-কে ঘিরে থাকত যে সব বিশ্বস্ত কর্মী তারা আমাদের বাদ দিয়েই রেখেছিল তাদের খাতা থেকে।

১৯৭০এ আসাম রাজ্য সংগঠনী কমিটির আগে পার্টি কনফারেন্স হয়। চারুদা যেতে চাইলেন। ভদু বোস তখন আসাম কমিটির চার্জে এলেন। ভদ্রলোক মূলত গৌহাটিতে থাকতেন। পার্টির কাজকর্ম প্রায় কিছুই করতেন না। কোন সিনেমা বাদ যেত না ভদ্রলোকের। একেবারেই অপদার্থ। কাজের মধ্যে কাজ ছিল

শলাপরামর্শ দেওয়া। তখন চারুদা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। কলকাতায় এসে দেখা করলাম। চারুদা ও সরোজ দত্ত দুজনেই যাবেন। আমি একটা পুরোন বুইক গাড়ী ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছিলাম। চারুদাকে সাজিয়ে ছিলাম পুরোদস্তুর সাহেব। পানামা হ্যাট, টাই কোট। আমিও ড্রাইভারের সাজে। পথে সরোজবাবুর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয় কয়েকটি বিষয়ে। এই ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই চারুদাকে অথরিটি বানিয়ে দিয়েছেন। বহরমপুর পেরিয়ে একটা ধাবায় খেলাম। সরোজবাবুর সঙ্গে তিক্ত কথা বিনিময়ের সময় চারুদা কিন্তু কোন পক্ষই নেন নি। চুপচাপ ছিলেন। বরং আমার প্রতি মধুর ব্যবহারই করেছেন। [এই প্রসঙ্গে ভদ্র বোসের বিবরণ হল, ভাস্কর ছেলেটা ভীষণ ফিকল্ মাইণ্ডেড অর্থাৎ অস্থির মতি। আসামের বোড়ো উপজাতির মধ্যে পার্টি সংগঠন করতে যায় স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যে সেখানকার সমস্ত গাঁজার ঠেক্‌গুলি চিনে নিয়েছিল। চারুদাকে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি নিজের উদ্যোগে ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে প্রচণ্ড হ্যারাসমেণ্ট করেছিল। রাস্তায় অন্ততঃ বাইশবার গাড়ী খারাপ হয়েছিল।] গৌহাটিতে পৌছে ভদ্র বোস আইসোলেট করে দিয়েছিলেন আমাকে পার্টি থেকে। এ কাজে তার সঙ্গে মদত দিয়েছিলেন সরোজবাবু। রাজ্য কমিটিতে ঢুকলাম শুধুমাত্র চারুদার জোরে।

কনফারেন্সের পর চারুদা আমাকে ডাকেন। বললেন 'পার্টি লাইনে আপস্ ও ডাউনস্ আছে একেবারে ইমিডিয়েট সমস্যাকে বেশি বড় করে দেখোনা। ঘটনা ক্রমশঃ আমার নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে। অসমীয়া ভাষায় সাহিত্য টাহিত্য ছাপ।' কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে চারুদা চলে গেলেন। ১৯৭০ সালের শেষে ভদ্র বোস চীন থেকে ফিরে এলে আমায় ডেকে পাঠালেন চারুদা। ভদ্র বোস আগে ছিলেন চারুদার বেজায় ভক্ত। খতমের লাইন ও চূড়ান্ত কর্তৃত্বের প্রবক্তা। চীন থেকে ফিরে আসার পর ভদ্র বোসের মধ্যে একটু পরিবর্তন দেখতে পেলাম। ফ্যানাটিক ভাবটা কমে গেছে মনে হল। লাইন অবশ্য একই। যাই হোক, এসে ভদ্র বোস আমায় বললেন,

চারুদা এখানে নেই। দেখা হবে না। এর কিছুদিন পরে ভদু বোস গ্রেফতার হয়ে যান। বিছানার নীচে ওঁর কাছে লেখা সুনীতিবাবুর চিঠি পায় পুলিশ। 'অমুক তারিখে আমরা বসছি পাম প্লেসে, চিঠি পড়ামাত্র পুড়িয়ে ফেলবেন।' সে দিনই সন্ধ্যেবেলা পুলিশ পাম প্লেসে রেড করে। সেদিনই বিকেলে চারুদাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বাড়িটা ছিল আমার বোনের। চারুদাকে ওখানে রাখা হয়েছিল পরিচয় দেওয়া হয়েছিল বোনের শ্বশুর বলে। আর যে ডাক্তার দেখত তার পরিচয় ছিল দেওর। ঘরে অক্‌সিজেনের ব্যবস্থা থাকত। বোন আমাকে পরে বলেছিল, 'এখানে থাকাকালীন বারবার তোমার কথা বলতেন।' সত্যিই চারুদার অত অপরিসীম স্নেহ আমার প্রতি না থাকলে কবে আমাকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হত তার ঠিক নেই।

চারুদা মারা যাবার মাস খানেক আগের ঘটনা। কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের কাগজ পত্র পাঠান বন্ধ করে দিয়েছে। রিপোর্ট যা পাঠাতাম তার ওপর কোন রিঅ্যাকশন হতনা বুঝতাম। এই সময় খোকন মজুমদার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রেন চারুদার কাছে পৌঁছোনোর জন্য। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার ওদের সঙ্গেও চারুদার কোন যোগাযোগ নেই। এই খবর শুনে আমি ভীষণ হতাশ হয়েছিলাম। দিলীপ ব্যানার্জী, দীপক বিশ্বাস, অনল রায় নামে কয়েকটা ফাটকাবাজ লোক চারুদাকে ঘিরে রেখেছিল তখন। সমস্ত সময় অক্‌সিজেন নিতে হচ্ছে, পেথিড্রিন ইঞ্জেকশন দিতে হচ্ছে ঘন ঘন চারুদাকে।

আমি এই সময় খোকনদাকে চিঠি লিখি—'খোকনদা আপনি যে করেই হোক, গেটক্র্যাশ করে চারুদার কাছে পৌঁছান।' কলকাতা তখন পার্টিজীবনে রীতিমত সন্দেহজনক শয়তানিতে ভরা জায়গা। শেষ পর্যন্ত খোকনদা সফল হলেন। একরকম জোর করেই চারুদার কাছে গিয়ে পৌঁছোলেন। ওদের দুজনের সম্পর্ক সেই ১৯৫১ সাল থেকে। খোকনদার প্রশ্ন—এই তো এতদিন ধরে আমরা চিঠি দিচ্ছি, রিপোর্ট পাঠাচ্ছি অথচ আপনাদের তরফ থেকে কোন উত্তর নেই।

চারুদা দীপক বিশ্বাসকে বলেন—'কি ব্যাপার? ওদের কোন চিঠি তো আমি বহুদিন পাইনি ওরা আমাকে জানাচ্ছে অথচ আমি বুঝতে পারছি না, পাচ্ছিনা কেন? তোমরা কি চেপে যাচ্ছ?'

চারুদার সঙ্গে আমাদেরও যোগাযোগ নেই। সত্তরে তিনি বন্দী ছিলেন সরোজবাবু ও ভতু বোসের। একাত্তরে দিলীপ ব্যানার্জীদের। এই শেষ দেখার সময় চারুদা খোকনদার সাথে 'জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ' এই লেখার বিষয়বস্তু আলোচনা করেন। আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও নাকি পোষন করেন। এরপরই তাঁর মৃত্যুর খবর শুনি ২৮শে জুলাই, ১৯৭২।

নিশীথের কথা

সিএমকে আমি প্রথম দেখি গ্রুপ মিটিংএ, সুশীতলদার বাড়িতে। সেটা হবে ৬৭'র শেষ অথবা ৬৮'র গোড়ার দিক। সেই প্রথম কলকাতায় মিটিং। পার্টি তখনও গঠিত হয় নি। আমাদের প্রধান মুখপত্র ছিল 'দেশব্রতী'। কলকাতায় আরেকটা গ্রুপ ছিল, তারাও মাও চিন্তাধারার অনুগামী বলে দাবি করত। তাদের পত্রিকার নাম ছিল 'দক্ষিণ দেশ'। সে সময় সিপি আই (এম) মাদুরাই কংগ্রেসে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে এবং পার্টিকে একটি সংশোধনবাদী বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত করেছে। মিটিংএ তিনি রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক আমাদের দেশ। তাই এ দেশে উপনিবেশিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রধান ভিত্তি কৃষকশ্রেণী এবং সেই শ্রেণীর সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ হল কৃষি বিপ্লব। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সংগ্রামের এলাকা গড়ে তোলা এবং সেই বিপ্লবী সংগ্রামের এলাকাকে প্রসারিত করে শহর ঘিরে ফেলা। কৃষক গেরিলা বাহিনী থেকে গণমুক্তি সেনা গড়ে তোলা এবং শহর দখল করে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা। অর্থাৎ মাও

সেতুঙ-এর জনযুদ্ধের তত্ত্বকে পুরো কাজে লাগানো। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পালটাতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করতে হবে এবং তা পারা যাবে একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। দুর্বল থেকে সবল হবার লাইনই হল গেরিলাযুদ্ধ। সুতরাং মিটিংএ সিএম ঘোষণা করলেন, 'অবিলম্বে বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিতে হবে। একাজ শুধু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলতে পারে না। কেন্দ্রীকতারও প্রয়োজন আছে। তবে পার্টির মুখপত্র দেশব্রতীই হবে।' মিটিংএ যারা 'দক্ষিণ দেশের' ছিল তাদের কথাটা মনঃপূত হয়নি। এ যেন গুরুপূজো! এটা কি কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং হল?

এরপর সিএম-এর সঙ্গে দেখা হয় যখন পার্টি ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি গঠন হয়ে গেছে। সিএম-এর বিরোধীরা বিতর্ক তুলছেন যে শহরের কাজকে অবহেলা করা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার ঝোঁক দেখা দিচ্ছে এবং গণসংগঠন গড়ার কাজকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। সিএম এর উত্তরে বললেন, ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কেন্দ্র হল কৃষিবিপ্লব। এটা গণসংগঠন দিয়েই শুধু হতে পারে না। তাই কো-অর্ডিনেশন গোপন সংগঠন গড়ার দিকে বেশি জোর দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিরোধীরা কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী আন্দোলনের কথা বলছেন। কৃষকদের বিভিন্ন শ্রেণী আছে, যথা দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক, মধ্য কৃষক, ধনী কৃষক—কাজেই কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী সংগঠন গড়া বলতে তারা কি বলতে চান তা স্পষ্ট নয়। সমস্ত কৃষকদের একটি শ্রেণী ধরে যদি গণসংগঠন গড়তে যাওয়া হয় তাহলে অনিবার্যভাবে সেটা ধনী ও মধ্য কৃষকের নেতৃত্বে আরেকটা কৃষক সভা হয়ে উঠবে। [যা আমরা এতদিন কমিউনিষ্ট পার্টিতে করে এসেছি—লেখক]। তাছাড়া কৃষকের মধ্যে প্রকাশ্য গণসংগঠন মারফত প্রকাশ্য আন্দোলনের ঝোঁক বাড়বে এবং আমরা আর একটি সংশোধনবাদী গণসংগঠনের নেতা হয়ে উঠবো।' এই রাজনীতির প্রবক্তা ছিলেন পরিমলবাবু, অসিত সেন, নাগি রেড্ডী প্রমুখ। সিএম এই মিটিংএ ব্যাখ্যা রাখলেন। তারপর আমায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

'আপনি কি করেন?' 'আমি অধ্যাপনা করি। পদার্থবিদ্যা পড়াই।' সিএম আমায় ভয় দেখাবার জন্য বললেন, 'এই রাজনীতি করলে বৌ ছেলে মেয়ে না খেতে পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। সহ্য করতে পারবেন তো?' আমি কেবল একটু মুচকি হাসলাম। আর কি-ই বা বলার ছিল?

এরপর ডালহৌসী কমিটিতে শ-দেড়েক সংগঠকদের বৈঠক হয়েছিল। এই মিটিংএ সিএম কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পার্টির নেতৃত্বে দরিদ্র-ভূমিহীন কৃষকের বিপ্লবী কমিটি হবে নতুন বিপ্লবী সরকারের প্রথম ভিত্তি। এই বিপ্লবী কমিটি না করলে বিপ্লবী সংগ্রামের উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে জনতার বিপ্লবী শক্তির বিকাশ ঘটতে পারে না। এই বিপ্লবী কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে ব্যাপক কৃষক জনসাধারণের সাহায্যে ও সক্রিয় সহযোগিতায় পলাতক ও নিহত ভূস্বামীদের জমি দখল করে তাকে পুনর্বণ্টনের কাজে হাত দিতে হবে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করার ব্যবস্থা করতে হবে, চরম দমননীতির মধ্যেও যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির গুণ্ডাবাহিনীর হাত থেকে কৃষক জনসাধারণকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে এবং তারই জন্য গড়ে তুলতে হবে গ্রামরক্ষিবাহিনী। কৃষক জনতার মধ্যকার বিরোধ সালিসীর মারফত মিটাবার প্রচেষ্টা নিতে হবে। শত্রুর গুপ্তচরবাহিনীকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সমস্তই করতে হবে দরিদ্র ভূমিহীন ও মধ্য কৃষকের সাহায্যে ও সহযোগিতায়। গুরুতর বিচ্যুতি না হওয়া পর্যন্ত এই বিপ্লবী কমিটির কাজে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। এই বৈঠকে সিএম যা বলেছিলেন তা আমরা সফলভাবে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করতে এখনো পারিনি। এই মিটিং-এ আবেগদীপ্ত গলায় কমরেড সিএম তেলেঙ্গানার বিদ্রোহে সাতজন কমরেডের রাইফেল নিয়ে লড়াই করে একে একে প্রাণদেবার বীরত্বপূর্ণ ঘটনার কথা রাখলেন। পেছন থেকে ফিস্ ফিস স্বরে কে যেন বলে উঠল 'নতুন

নেতৃত্ব যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার গ্যারান্টি কোথায় ?' আস্তে বললেও সিএম বোধহয় কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন—'সংগ্রামী জনতা যদি সেদিনকার মত অস্ত্রের জন্য কেন্দ্রের দিকে না তাকিয়ে থেকে, স্থানীয়ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতকতা করলেও সংগ্রামের বিপর্যয় হবে না।' শ্রেণীশত্রু খতম প্রশ্নে বললেন, 'খতম মানে সামন্তপ্রভূদের রাজনৈতিক সামাজিক ও সামরিক সবরকমের শক্তির বিলুপ্তি।' সেই মিটিং-এ আমায় দেখতে পেয়ে চিনতে পেরেছিলেন—'কি প্রফেসর, কি খবর ?'

একবার কলকাতায় আশি থেকে একশ জন বাছাই করা যুবছাত্র কমরেডদের মিটিং হয়। সিএম তখন 'বিপ্লবী যুব-ছাত্রদের প্রতি কয়েকটি কথা' লিখেছেন। বিশাল একটা ঘর, একশ বাই একশ ফুট, মেঝেতে কার্পেট বিছানো, কেউ কেউ মাটিকে বসে আছে। সেই মিটিং-এর বক্তব্য নোট নিয়ে সংশোধন করে পরে লেখাটি বেরোয় বেরোনর পর হৈ চৈ পড়ে গেল। উপস্থাপনায় একজনই, সিএম।। দেড়-দু পাতার নোট। সরাসরি কথা বলতে ভালোবাসতেন। সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট। 'দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই যুব-ছাত্ররা বিপ্লবী হতে পারবে। তার আগে নয়। পাড়ায় পাড়ায় ইস্কুল কলেজে চার পাঁচজনের ছোট ছোট স্কোয়াড তৈরী কর। তারপর ৪/৫ দিনের ছুটিতেই গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়ার প্রোগ্রাম কর। মাও চিন্তাধারা তাদের শোনাও, সারা ভারতের বিপ্লবী কৃষক যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী তাদের শোনাও। প্রথম প্রথম তারা তোমাদের বিশেষ পাত্তা দিতে চাইবেন না। কেন না স্বাভাবিক কারণেই তোমাদের তারা অবিশ্বাস করবেন। মনে রাখবে আগামী দিনে আজকের এই দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকই ভবিষ্যতের বাবুলাল বিশ্বকর্মা। ফিরে এসে সমস্ত যুবছাত্রদের রেডগার্ড স্কোয়াডের অধীনে জমায়েত করে শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক প্রচারে নামো।' গোটা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেন এসব কথাগুলি বলছিলেন। উৎসবের মতো

এই অভিযানের হাওয়াটা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে বলেছিলেন।

সিএম পার্টির একদম সামনের সারিতে এমনিতে তো আসেন নি। তেভাগা-তেলেঙ্গানার পথ পেরিয়ে ১৯৬২ সাল থেকেই লাগাতার সংশোধনবাদ বিরোধী লড়াইয়ের মধ্যে তাঁর অভ্যুত্থান ও বিকাশ। আটটি দলিল, সিপিআই-এম থেকে এম-এলের রাজনীতিতে উত্তরণের প্রথম ধাপ। শুধু চীনের নয় পৃথিবীর দিকে দিকে কমিউনিস্টরা নকশালবাড়িকে ভারতের মুক্তির দ্যোতক হিসেবে দেখেছেন। মালয়ের রবার বন থেকে বিশ বছর সংগ্রামরত বীররা অভিনন্দন জানিয়েছেন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়ার কমরেডরা স্বাগত জানিয়েছেন বসন্তের বজ্র নির্ঘোষকে, তখন তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বোঝা যায়। তাঁকে ফোরফ্রন্টে আনার উদ্দেশ্য ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর একটা মিটিং-এর কথা যতটুকু মনে আছে বলি। তারাতলা শ্রমিক বেল্টে তখন ডজনে ডজনে শ্রমিক আমাদের রাজনীতির ছত্রছায়ায়। সিএম বলেছিলেন, 'ছাইগাদায় যেমন কুকুর পড়ে থাকে, শ্রমিকদের মধ্যে আপনারা তেমনি পড়ে থাকুন। একটা মিছিল করুন যাতে পাঁচ হাজার না হোক পাঁচশো লোক হয়। কিন্তু মিছিলটিকে অবশ্যই সশস্ত্র হতে হবে।' ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১০,০০০ শ্রমিকের মিছিল বেরোয় যার মধ্যে অন্ততঃ দুশো-জন ছিল সশস্ত্র। সেই বছরই অক্টোবর বিপ্লব উপলক্ষে ব্রিগেড থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত ৮০,০০০ লোকের মিছিল হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল একটাই, এই রাজনীতি ব্যাপক মানুষের মধ্য আশা জাগাবে। এর জন্য আমাদের তর্কবিতর্ক করতে হয় নি। ২০,০০০-এর মত লোকের সঙ্গে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পেটো ইত্যাদি ছিল।

এরপর প্রস্তুতি নিলাম এলাকায় এলাকায় আমরা মিছিল করব। কিছু ছেলে প্রশ্ন তুলল 'আপনারা প্রকাশ্যে যাচ্ছেন কেন?' আমি বললাম 'এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে উচ্চতর কমিটিতে আমি তোমাদের কথা জানাব। তবে মিছিল করার কথা এবার সিএমই আমাকে বলেছেন, শত্রুর নজর এড়িয়ে রাজনীতিকে আমরা কিভাবে জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি মিছিলের তাই উদ্দেশ্য।'

—আমাদের মনে হয় আপনারা হঠকারিতা করছেন। সরোজদা এনিয়ে লিখলেন। তখন পার্টিতে সিদ্ধান্ত হয়—তাত্ত্বিক প্রশ্নে বক্তব্য একমাত্র সিএমই রাখবেন। আসলে সিএম সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত যা কিছু অভিজ্ঞতা তা সরোজদা মারফত। ওঁর চোখ দিয়েই সিএমকে দেখেছিলাম। তবে বলা হয়ে থাকে চীন নিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করেছিলেন এটা আমি মানতে একদম রাজী নই কারণ মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা সূত্রায়িত হয় মাও বেঁচে থাকাকালীন। আর চীন মুক্ত হবার বিশ বছর পরেও ওপথে কমিউনিস্ট নামধারী কেউ পা মাড়ান নি, তাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা বর্তমান যুগের মার্কসবাদ হিসাবে বিকাশিত, এটা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদেরই শ্লোগান, এতে ভুল কিছু নেই। সেই সময়কার প্রকাশকে আজকের চোখে দেখলে কিছুটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু মাওয়ের সেই শিক্ষাটা মনে করলে তখনকার পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য হবে। তিনি বলেছিলেন, দীর্ঘদিনের কোন অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করতে হলে হয়ত অনেক সময় একটু বেশিই বাঁ-দিকে চলে যাওয়া যায়। তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ এটাই ইতিহাসের নিয়ম। আর একটা জিনিষ মনে হয় আত্মত্যাগের ব্যাপার, যেটা কমিউনিস্টদের অবশ্যই বড় গুণ। বোকাবুড়োর পাহাড় সরানো, আটটি ধারা ও তিনটি বৃহৎ শৃঙ্খলার উল্লেখ এবং নিজের মধ্যে সংগ্রাম করে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেওয়া শোধনবাদী বুর্জোয়াদের কাছে নেহাৎই 'বোকামো' ও 'ছেলেমানুষী'।

গুরুপদ, যে সিএম'এর ক্যুরিয়ার ছিল, ওর কাছেও শুনেছি সিএম গ্রুপ মিটিংএ যেকোনও লোককে উজ্জীবিত করতে পারতেন। সিএম বলতেন, 'রাজনীতির প্রথম কথাটাই হল অনুশীলন, প্রয়োগ। কৌশলগত লাইন যদি ঠিকও হয় তাহলেই কি বিপ্লব হয়ে যাবে?' গুরু আমায় বলেছিল, সিএম খুব অদ্ভুত কথা বলতেন যা আমার ক্ষেত্রে অনেকবার খেটেছে। 'যখন ধরা পড়ার কথা চিন্তা করছ না তখনই হয়ত ধরা পড়তে পার।' সিএম'র মূল্য বোঝাতে গিয়ে গুরু একটা ঘটনার উল্লেখ করেছিল সেটা আমার মনে আছে। টিটাগড়ে কংগ্রেসী

গুণ্ডাদের আখড়া ছিল হিন্দুস্তান পালোয়ানদের মধ্যে। এরা মুসলমান-দের সঙ্গে দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা করছিল। আমাদের পার্টির কমরেডরা যারা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিল তারা রাতারাতি দাঙ্গাবাজদের নাম উল্লেখ করে পোষ্টার মারে, 'দাঙ্গা লাগালে গলা কেটে নেওয়া হবে'। ঐ সামান্য কয়েকটা পোষ্টারেই টিটাগড়ের দাঙ্গা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। এতে বোঝা যায় সেই সময় আমাদের রাজনীতি জনগণের মধ্যে কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর সেই রাজ-নীতির উৎস ছিলেন কমরেড সিএম।

মঞ্জুষার কথা

১৯৬৯ সালের মে মাসে কলকাতায় পার্টির একটা মিটিং ছিল। আমার স্বামী মিটিং সেরে এসে বললেন,—'রায়মশাই আজ আসবেন সরোজবাবু ও স্নীতিবাবুর সঙ্গে।' সরোজবাবুকে চিনতাম না। তবে রায়মশাই যে চারু মজুমদার এটা বুঝতে পেরেছিলাম। বন্ধুর কাকা এই হিসাবে বাইরে পরিচয় দেওয়া হবে এবং ঠিক হল আমি কাকাবাবু বলে ডাকব। ভয় ভয় করছিল কিভাবে অভ্যর্থনা জানাব। ওঁরাই সহজ করে নিলেন। চা খেয়ে কাকাবাবুর থাকবার ঘর দেখে সরোজবাবু ও স্নীতিবাবু চলে গেলেন। এসেই কাকাবাবু সহজভাবে মোড়া টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন,—'আমি হাঁড়ির খবর নিতে ভালবাসি। কমিউনিস্ট পার্টি যারা করে তারা নিজেদের কমরেডরা খেতে পায় কিনা তার খোঁজও করে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করলেন, ক'ভাই বোন, কে কি করে। আমি বালীগঞ্জের মেয়ে ; এত কৌতূহল প্রথম চোটে খুব একটা পছন্দ হয় নি, একটু গেঁয়ো গেঁয়ো লেগেছিল। আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জন্ম কোথায় ?'
—'কুচবিহারে।' তারপর কাছে পিঠের লোকজনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। 'বাবা কি করতেন ?' যেন বললেই চিনতে পারবেন এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন কাকাবাবু।

—'আমার বাবা ফণিভূষণ চ্যাটার্জী, কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন কুচবিহারে ভিক্টোরিয়া কলেজে।'

—'আচ্ছা, ল্যা ডলীমোহন মিত্র'র কেমিষ্ট্রি বইতে যাঁর নাম আছে?'

এত অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখে আমরা দুজনেই অবাক হয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই যখন আই.এস.সি. পড়তেন তখনই দেখেছেন। তাছাড়া নামটা নিশ্চয়ই ছিল ভূমিকাতে, মূল বইতেও নয়। এত তীক্ষ্ণ ছিল যাঁর মেধা তিনি কিন্তু আই.সি.এস. পরীক্ষাও দেন নি। এটা অবশ্য পরে জেনেছি।

একদিন বর্ষার সময়। আমার কলেজ তখন বন্ধ। বলতে ভুলে গেছি, তখন আমি পার্ট ওয়ান পড়ি। আমাদের মনমেজাজ খুব ভাল। কাকাবাবু বললেন, 'আজ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার আদর্শ আবহাওয়া।' এরপর কালিদাসের মেঘদূত থেকে সংস্কৃতে একের পর এক শ্লোক অবিশ্বাস্য দক্ষতায় আবৃত্তি করতে লাগলেন। সেদিনটা আমরাও তাঁর সঙ্গে ঘোরে মেতে ছিলাম। সঙ্গীত তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। ক্লাসিকাল সম্বন্ধে বলতেন, 'জানি যদিও এগুলি সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি, মূলত কোর্ট মিউজিক, তবুও আমি তা ভালবাসি। সামন্ততন্ত্রের সবই খারাপ নয় কি বল?' ভেবে দেখুন, পার্টি কাগজে তখন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখা বেরোচ্ছে। একদিন জবা গুহ বলে আমাদের এক বন্ধু এলেন। উনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। জবা সেদিন পরপর বেশ কয়েকটা অতুলপ্রসাদের গান গাইলেন, দুপুর বেলা। খা খা করছে রোদ্দুর। ভেবেছি ওঘরে কাকাবাবু হয় ঘুমোচ্ছেন নাহলে বই পড়ছেন। বই পড়ার নেশা ছিল অসম্ভব। পছন্দনই কোনও বই হাতের কাছে পেলে আর রক্ষা নেই। শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়া নেই। এমন কি ফার্মাকোপিয়া পর্যন্ত মুখস্থ। যাই হোক, জবা চলে গেলে ক্যাঁচ করে দরজা খোলার শব্দ হল। দেখি কাকাবাবু মুখ বার করে বললেন, 'চমৎকার গলা তো মেয়েটির।'

আমার দাদু ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি বাঘা যতীন বলে পরিচিত ছিলেন। তাই শুনে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি

এত ভয় পাচ্ছেন কেন?' আমি বললাম, 'সেইজন্যই তো বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আমার এত আতঙ্ক।' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর জিজ্ঞেস করতেন। আয় কত, কি খাওয়া হয়, কে কি পড়ে। সম্বলের মতো সঙ্গে ছিল তাঁর একটা কাপড়ের ঝোলা। তাতে দুটো লুঙ্গি। এক জোড়া প্যান্ট-সার্ট। চা খুব সুন্দর বানাতেন এবং চা খেতেও খুব ভালোবাসতেন। চা দেখে বলে দিতে পারতেন কিরকম চা। আমায় বলতেন 'প্রথম ফোটা জলে চা করবেন। তার টেস্ট সবচেয়ে ভালো।' উত্তর বাঙলা থেকে কমরেডরা কাকাবাবুর জন্য চা পাঠিয়ে দিতেন। অনেকবার সুনীতিবাবু পৌঁছেও দিয়েছেন। ওঁর শৌখিনতার মধ্যে একটা ছিল টোবাকো মিক্সচার কাগজে পাকিয়ে খাওয়া। পরে পাইপ ধরেছিলেন। মনে আছে আমার স্বামী ডিপি একবার প্রিন্স হেনরী তামাক এনেছিলেন। উনি খেতেন ক্যাপস্টান মিক্সচার। খুব একটা পছন্দ করেন নি।

খুব ভোরে উঠতেন। আমাদেরও আগে ঘুম থেকে উঠে চানটান করে আস্তে ট্রানজিস্টরটা চালিয়ে গান শুনতেন। সাহিত্যের বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন। যা পেতেন তাই পড়তেন, ইকনমিক্সের বই, এমনকি হোমিওপ্যাথির বই পর্যন্তও। প্রথমে সাতদিন থাকার প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছিলেন। তবে একনাগাড়ে বেশিদিন থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমে এসে গুরুপদদের বাড়ীতে ওঠেন। কিন্তু কমন বাথরুম হবার ফলে অসুবিধে হয়। কারণ লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার দরকার ছিল তাঁর। খেতে বসে গল্প করতেন, অনেক গল্প জানতেন। রাজনীতি সম্বন্ধে আমি ছিলাম বিতৃষ্ণ। উনি বলতেন, 'মানুষের মধ্যে যদি পারস্পরিক ভালবাসা থাকে তাহলে দেশ ঠিকঠাক চলবে। কর্মীদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক থাকলে তবেই পার্টি ঠিকমত এগোবে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে। অফিসে দেখা গেল একটা লোক হাড়-কিপটে। কাউকে এক কাপ চাও পর্যন্ত খাওয়ায় না। হেঁটে বাসের ভাড়া বাঁচায়। তাই বাসের ভাড়া বাড়লে হয়ত খুশীই হয়। সেই লোকটাই হয়ত বাড়ী ফেরার পথে ট্রেন ধরার আগে হাওড়া স্টেশন থেকে মেয়ের জন্য পুতুল কিনে নিয়ে যায়। সকাল-

বেলা মেয়ে যে আবদার ধরেছিল বাবার কাছে তা সে রাখে নিজেকে বঞ্চিত করে। বিপ্লব তখনই সফল হবে যখন ব্যাপক মানুষ আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকবে।'

তিনদিন কাকাবাবু থাকার পর আমার মনের অবস্থা এমন হল যে উনি চলে গেলে যেন আমার একজন অতি প্রিয়জন চলে যাবেন যা আমি চাইছিলাম না। অথচ একই সঙ্গে এই তিনদিন সারাক্ষণ বুকের মধ্যে দুরদুর করেছে। উনি যা বলতেন তাই শুনতে ভালো লাগত। সরোজবাবু এবং কাকাবাবুর মধ্যে তফাৎ ছিল—সরোজবাবু বৃথা বাক্য-ব্যয় করতেন না। কাকাবাবু ছিলেন অন্যরকম, হয়ত কাজের লোক আসে নি, সে ব্যাপারেও পরামর্শ দিচ্ছেন। উনি বলতেন, 'মামনের সব কাজ করে দেবেন না। ওর তো বছর চারেক বয়স হয়েছে। কিছু কাজ ও করতে পারে। ওকে রোজ কোন না কোন কাজ দিয়ে রাখবেন। লক্ষ্য করবেন ও সেটা করল কি না। বলবেন, জুতোর তাক পরিস্কার করবে। কিংবা ফেলে রাখা জিনিসটা তুলে রাখ। বিনা পরিশ্রমে কোন জিনিস পাওয়া যায় না এটা যেন সে বুঝতে পারে। এটাই আসল শিক্ষা যে শিক্ষা অবশ্য আমি আমার নিজের বাড়িতেও প্রয়োগ করতে পারিনি।'

সুনীতলবাবু, সরোজবাবু প্রায়ই আসতেন। সারা দিন সারা দুপুর থেকে বিকেলে চলে যেতেন। সাতদিনের মাথায় কাকাবাবু বললেন এবার চলে যেতে হবে। শুনে আমার খুব কষ্ট হল। তাতে উনি বললেন 'বুঝতেই তো পাচ্ছেন। ফেরারী জীবন। কাজে তো যেতেই হবে।' সারাদিন আমার মন খারাপ। বিকেলে সরোজবাবু আর সুনীতিবাবু ফিরে এলেন। যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে কাকাবাবুকে রাখার খুব অসুবিধে। তিনদিন বাইরে থেকে আবার ফিরে এলেন। আমি তো বেজায় খুশি। সঙ্গে ছিল তার হাতে তৈরী একটা সস্তা ট্রানজিস্টর। যেদিন পিকিং রেডিও থেকে প্রথম সি পি আই (এম-এল)-কে স্বীকৃতি দিল সেদিন কাকাবাবুর শরীর ভীষণ খারাপ। টলতে টলতে বেসিনে মুখ রাখলেন। রক্ত বমি করলেন। সেই সময় খবরটা রেডিওতে ঘোষণা হচ্ছিল। কি ওষুধ দেব?

সুনীতিবাবুকে জানালাম। উনিও খুব চিন্তিত হলেন। পরদিন সুনীতিবাবু ডাক্তার নিয়ে এলেন। বার্মার কমিউনিস্ট ডাক্তার ঘিসালের বোনও এসেছিলেন। ওষুধ ইঞ্জেকশন দিলেন। কার্ডিয়াক অ্যাজমা ছিল তা থেকে রক্তবমি হত। এত কষ্ট হত টান উঠলে চোখে দেখা যায় না।

ওঁনার ঘরে আর একটা সিঙ্গল খাট ছিল। সুশীতলবাবু সারাদুপুর থাকতেন! ওঁরা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন তখন আমরা কাছে যেতাম না। মামনকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। কাকাবাবুর টেনশনের জীবনে মামন ছিল তাঁর রিলিফ। রূপকথার সমস্ত গল্প তিনি শোনাতেন মামনকে। দুজনে মিলে কাগজের খেলনা তৈরী করতেন। জাহাজ বানিয়ে দিতেন কাগজের। সরোজবাবু কিন্তু অন্যদিকে বেশি সময় নষ্ট করতেন না। মামনের বাবা মেয়ে পুতুলটুতুল নিয়ে খেলবে এটা পছন্দ করতেন না। উনি অন্যদিকে মামনের সঙ্গে খেলনাবাটি নিয়ে খেলা শুরু করেছেন। এত স্নেহ প্রবণ মানুষ আমি জীবনে আর একটাও দেখিনি। একবার মামনের ভয়ঙ্কর কাশি হয়েছিল। কাকাবাবু যে ঘরে থাকতেন তার পাশের ঘরেই আমরা ছিলাম। সারারাত মামন কাশছিল। তখন পার্টি কমরেডরা শ্রীকাকুলামের কমরেডদের জন্য ওষুধের প্যাকেট আমাদের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। পরদিন পাঠানো হবে, কাকাবাবু উঠে এসে ডিপিকে বললেন 'ওষুধের বাক্সটা খুলুন। ডিপি রাজী হলেন না 'ওগুলো শ্রীকাকুলামের কমরেডদের জন্য কালই যাবে। ওগুলো না খুললে হয় না? কাকাবাবু ডিপিকে এক ধমক দিয়ে নিজেই খুলে ফেললেন ওষুধের বাক্স। ট্যাবলেটের স্ট্রীপ, ওষুধের শিশি, ক্যাপসুলের ফয়েল দেখে দেখে ওষুধ বার করে বললেন এইটে দুডোজ দিয়ে দিন তো। আশাকরি ভাল হয়ে যাবে।' আশ্চর্য ব্যাপার সেই রাতেই কিন্তু মামনের কাশি সেরে গেল। এই মানবিক ব্যাপারটাই ছিল কাকাবাবুর কাছে বেসিক মূল্যবোধের ব্যাপার। কারুর কষ্টের কথা শুনলে তাঁর চোখ ফেটে জল আসত। মামনের সঙ্গে খেলনা নিয়ে খেলতে খেলতে অনেক রকম গল্প বিশেষ করে সাহসের গল্প বলতেন।

খেতেটেতে বেশ ভালোবাসতেন। ভোজনরসিক ছিলেন যাকে বলে। জীবন রসিকও বটে। ভালো জিনিষ খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন। কাঁকড়া খেতে খুব ভালবাসতেন। একদিন সাড়াশী দিয়ে কাঁকড়া ভাঙ্গছেন এদৃশ্য দেখে সরোজবাবু তো হেসে খুন। একদম গড়িয়ে পড়ছেন। কাকাবাবু বললেন হাসতে হাসতে, আমাদের সমাজে শ্রমবিভাগ কি বলুন তো? সরোজবাবু তো থতমত খেয়ে গেলেন 'মানে?' 'আমাদের কাছে ডিভিসন অফ্ লেবার মানে মেয়েরা রান্না করবে আর ছেলেরা খাবে। আসলে বুঝতাম কষ্ট করে রান্না করছি এটাই ওনাকে স্পর্শ করত। আমি কিন্তু ওঁরা খেয়ে তৃপ্তি পাবেন তাতেই আমার ভালো লাগবে এরকমই ভাবছিলাম? আসলে, কাকাবাবুর মধ্যে ছিল একটা সমব্যথী মন। তিনি বলতেন, আমরা সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করব বলছি বটে কিন্তু তাহলে ভালো জিনিষগুলি চলে যাবে। চা খেতে ভালবাসতেন বলে বলতেন 'চা'র গ্রেড আছে কিন্তু কফির গ্রেড নেই।' ক্ল্যাসিক্যাল গান শুনতে ভালবাসতেন', আমাদের সংস্কৃত কবিতা অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতেন, নিজেও গাইতেন। মূলত শৌখিন ছিলেন কিন্তু ব্যবহারে শৌখিনতা ছিল না। একবার ৮ দিন বাদে ফিরে আসার পর দেখি লুঙ্গি তেলচিটচিটে। পরে শুনলাম লীলাদি এসেছিলেন শিলিগুড়ি থেকে। ওদের জন্য বস্তীর একটা ঘরে থাকার বন্দোবস্ত হয়। আমাদের বাড়িতে নিরুপায় হয়েই থাকতেন। পরে শুনেছি বাড়ি ভাড়া করে তাঁকে রাখতে হয়েছে। নাগভূষণ পট্টনায়ক ও আপ্পালাসূরী ধরা পড়ার পর আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

একদিন আমাদের পাশের বাড়িতে তুমুল চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হল। কাজ করার মহিলাটি দারুণ খারাপ খারাপ ভাষায় গালাগাল দিয়ে কথা বলছে। এত খারাপ কথা যে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। বিরক্ত হয়ে নিজের মনে মনে বলেছি, 'এত জঘন্য ভাষায় কথা বলছে শুনতে বিচ্ছিরি লাগে।' কাকাবাবু তার উত্তরে বললেন, 'উনি খারাপ খারাপ কথা বলছেন সেটাই আপনার কানে বাজছে আর উনি যে কি গুণের অধিকারি তা'ত জানেন না। আমাদের

শিক্ষাই এমন যে খারাপ জিনিসগুলিই আগে চোখে পড়ে।' কাকাবাবু সত্যিই যে গভীরতার দাগ ফেলে গেছেন তা কোনদিন মুছবে না। ছোটখাট সংসারি কাজে তিনি সাহায্য করতেন। আমার পার্ট ওয়ান পরীক্ষার সময় বাড়িতে যে ঝি-টি কাজ করত সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। বাড়িতে ২৪ ঘণ্টা উনুন জ্বালাতে হয়। সব সময় খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। আমার সে এক নাকানি-চোবানি খাবার মত অবস্থা। আরেকজনকে পেলাম তিন-চারদিন বাদে। একেতেই পরীক্ষা তার-উপর এত কাজ সামাল দিয়ে উঠতে পারছিলাম না। যাই হোক, নতুন ঝি-টিকে বহাল করার দুদিনের মধ্যে পুরোনটি এসে হাজির। পুরোনটি রান্নাবান্না অবশ্য খুব ভালো করত, সেই তুলনায় নতুনজনের রান্না পাতেই তোলা যায় না। কাকাবাবু বললেন, দুজনেরই অভাব রয়েছে। যে ছেড়ে চলে গেছে তার সুবিধাতে গেছে আপনাকে বিপদে ফেলে। সুতরাং তাকে আর রাখা যায় না। এখন যে আছে সেই থাক।'

এরপর কাকাবাবু নিজের সংসারের একটা গল্প বললেন, 'আমাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে একটা নেপালী ছেলে কাজ করত। সারাদিনের জন্য থাকত। আমাদের বাড়িতে একটা নিয়ম ছিল যে আসত সে সাধারণত না খেয়ে যেত না। পরে আমি জানতে পারলাম ছেলেটি আপ্রাণ চেষ্টা করত আমাদের বাড়িতে কোন গেস্ট এলে তাঁকে তাড়াবার। একথা জানতে পেরে ছেলেটাকে আমি একদিনও বেশি রাখিনি। স্ত্রীর উপর প্রেসারের চাইতে আমাদের কমরেডদের জীবন অপেক বেশি জরুরী। এরকম খুঁটিনাটি ব্যাপারে উনি অদ্ভুত সহজভাবে মীমাংসা করে দিতেন। আমার রান্না ঘরের কোথায় কি আছে জানতেন। হয়ত ঘরে বই পড়তে পড়তে মিটসেফের পাল্লা খুলে আচারের শিশিটা তিনি বার করে দিয়ে গেলেন। আমি হয়ত সেটা খুঁজছিলাম।

একদিন আমার মেয়ে মামন জেমিনি সার্কাস দেখার জন্য বায়না ধরেছে। তখন বাড়িতে কাকাবাবু ছাড়াও সরোজবাবু ও সুশীতলবাবু রয়েছেন। ওরা সবাই মামনকে খুবই ভালোবাসতেন। কাকাবাবু

বললেন, 'হ্যা ওরই তো সার্কাস দেখবার বয়স। নিয়ে যান ওকে। আমাদের কোন অসুবিধে হবে না তিন-চার ঘণ্টা এই ঘরে বন্দী থাকতে।' ভারতের তিনজন শ্রেষ্ঠ নেতাকে তালাচাবি দিয়ে আমরা চললাম। এই যে তিন ঘণ্টা ওদের কষ্ট হবে সেটা কোন ব্যাপারই নয় যেন। আমাদের বাড়ি ছেড়ে যাবার পর উনি এসেছেন কয়েকবার। কিন্তু কাউকে হয়ত মিট করার জন্য, থাকেন নি। কিংবা বাড়িতে দুয়েকবার কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ। ওনার ক্যুরিয়ারই যোগাযোগটা রাখত।

কমরেডদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বে উনি আস্থাশীল ছিলেন। মনে আছে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উপলক্ষে বিশে জুলাই দেশব্রতীর বিশেষ সংখ্যা বেরোবে। ডিপির কাছে ভিয়েতনামের বীর বিপ্লবী ভ্যানত্রয়ের ছবি ছিল। ডিপি সরোজবাবুকে ছবিটা 'এভাবে দিন, ওভাবে দিন বলাতে কাকাবাবু বললেন, 'যে বেশি বোঝে ব্যাপারটা তার ওপরই ছেড়ে দিন। অর্থাৎ সরোজবাবুকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন।' সুনীতিবাবুকে নিয়ে সরোজবাবু মজা করতেন তাতে কাকাবাবুও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। সুনীতিবাবুর সৌম্যকান্তি গৌরবর্ণ চেহারা। উত্তর কলকাতার বাবু বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। পরিস্কার পাটভাঙ্গা পাঞ্জাবী এবং কোঁচানো ধুতি। হাতে কোঁচাটি নিয়ে তিনি হাঁটতেন। ওরা তিনজনেই বাইরে কোথায় গেছেন, বোধহয় ব্যাঙ্গালোরে হবে। সরোজবাবু কোঁচাটা হাত থেকে তাঁরই পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সুনীতিবাবু হাত নিয়ে কি করবেন ভেবে অস্থির হয়ে পড়ছেন। কাকাবাবু তো হেসেই অস্থির। সুনীতি বাবু শেষ পর্যন্ত বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, কোঁচাটা আমাকে হাতেই ধরতে হবে। হাত ভীষণ খালি খালি লাগছে।' পরে বেশ কিছু কমরেড রাজনৈতিক কারণে সুনীতিবাবুর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কাকাবাবু ও সরোজবাবু দুজনেই সুনীতিবাবুর সততার গল্প করতেন তাদের। কলেজের চাকরী ছেড়ে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করা ক'জন পারে? আসলে সুনীতিবাবুর সফিস্টিকেশনের জন্য অনেকে তাকে ভুল বুঝত। তিনি মশারীও পর্যন্ত গুজতে পারতেন না। যাই হোক,

একজন কাকাবাবুকে প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট দিয়েছিলেন। তিনি এরপর পাইপ ধরলেন। চুলের কায়দাও বদলেছিলেন। সরোজবাবুও ধুতি-পাঞ্জাবী ছেড়ে প্যাণ্ট-শার্ট ধরেছিলেন।

কাকাবাবুর গল্প বলি, তেভাগা পিরিয়ডে পুলিসের প্রচণ্ড হামলা অত্যাচার। একজন আদিবাসী কমরেডকে পুলিস কিছুতেই ধরতে পারে না। 'কি ব্যাপার বাজল?' 'সে আমার একটা জায়গা আছে।' কিছুতেই বলে না। তারপর শুনলাম কমরেডটি পুলিসের গন্ধ পেত। এবং গন্ধ আগে থেকে পেয়ে যেখানে ঢুকত সেটা হল শেয়ালের গর্ত। একবার পুলিস হামলা করার সময় কাকাবাবুকে নিয়েও সেখানে ঢুকেছিল। আর একবার কাকাবাবু তখন সবে যুবক। কংগ্রেসের সোস্যালিস্ট ফোরামে আছেন, পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। আগাগোড়া কৃষকদের মধ্যে কাজ করতেন। লাঠির ডগায় ঝোলা লাগিয়ে ঘুরতেন। কাকাবাবুর কথায় 'ঝাঁঝাঁ রোদ। হেঁটে ভীষণ ক্লান্ত। ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আর হাঁটতে পারছিলাম না। কাঁধের ঝোলাটা মাটিতে ফেলতেই গোখরো সাপটা ফণা তুলে দাঁড়াল। আমি চমকে গেলাম। ভয় যেন আমাকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। এক মিনিট মানে অনন্ত কাল। তারপর সাপটা আমাকে ছোবল মারতে না এসে সরসর করে চলে গেল। ওদের সাধারণত বিরক্ত না করলে আক্রমণ করে না।'

একদিন কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং। কানু সান্যাল তখন জনমানসে নায়ক। কানু ছাড়া গতী নেই। তিনিও আসছেন। সরোজবাবুকে বার বার জিজ্ঞেস করেছিলাম কানু সান্যাল আসছেন তো? জনা কুড়ি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এসেছিলেন সেদিন। শরাফ, শিউকুমার মিশ্র, সত্যনারায়ণ, নাগভূষণ, আদিভক্ত কৈসলম, ভেমপ‌টাপু, আপ্পু, এছাড়া বাংলার সবাই তো ছিলেনই। আমি তো কানুবাবুকে দেখার জন্য ভীষণ আগ্রহী। সরোজবাবুই ভীড়ে হারিয়ে যাবার মত একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন 'ইনিই কানু সান্যাল।' একেবারেই হিরো চেহারা নয়। আমি লজ্জাও পেলাম

হতাশও হলাম একই সঙ্গে মোহমুক্ত হলাম। আরও স্বপ্নভঙ্গ হল। ইস্ কি লজ্জা। সরোজবাবু বলে উঠলেন 'দেখুন, আপনার সঙ্গে হিরোর আলাপ করিয়ে দিলাম। এক কাপ চা পেতে পারি তো?'

একদিন কানু সান্যাল সম্বন্ধে কাকাবাবু বলছিলেন। 'কানু এমনিতে খুব সাহসী ও ভাল কর্মী। শিলিগুড়িতে দাঙ্গা বেঁধেছে। গুণ্ডারা মিছিল করে আসছে দাঙ্গা করতে। আমি আর কানু ছিলাম। কানুকে বললাম, চল আমরা এগোই। মরি তো মরব। আমি একটা তীব্র হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। তাইতে কানু এগিয়ে গিয়ে একজনের কলার ধরে ঘুসি মারল। আমি ওরকম একটা হুঙ্কার দিয়েছিলাম বলেই ও এগিয়ে গেল। ওকে চালিত করলে চলে। সবসময় মাথায় একজন থাকা দরকার ওর।' কাকাবাবুর দৈহিক অবস্থা খুব খারাপ। নিজে অনেক সময় লিখতেও পারতেন না। ডিক্টেট করতেন, অন্যে লিখে নিত। ঐ শরীর নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহারে গ্রামের পর গ্রামে তিনি গেছেন। একদিন খাবার টেবিলে খবর পেলেন কৃষ্ণমূর্তি শহীদ হয়েছেন। কাকাবাবুর সে কান্না ভোলার নয়। ওঁর কাছে শুনেছি, সবেলাল বলে একজন লড়াকু কমরেড পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময় করে প্রাণ দেন। মিটিং করতে এসে মল্লিকজোতে পুলিস ঘিরে ফেলে। সবেলাল গুলি ছুঁড়ে ঘেরাও ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে পুলিশের দিকে গুলি ছোঁড়েন তাঁর পিস্তল থেকে। অনেক রাত্রে মাথা তুলে তিনি যখন এগোতে যান তখন পুলিশের বুলেট তাঁর মাথা ঝাঁঝড়া করে দেয়। সেদিন সবেলালের শোকসভা। শিঙায় টোকা বসিয়ে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে কাকাবাবুকে আনা হয়েছে। তাঁর শরীর খুব খারাপ। কাকাবাবু-বলেছিলেন, 'জমি নিয়ে আন্দোলন করার অধিকারও আজ আমাদের নেই। কারণ আন্দোলন করতে গেলে জোতদার বন্দুক নিয়ে আসে। পেছন পেছন আসে পুলিশ, তার সাহায্যে। আমাদের অবস্থা তো কবুতরের মত—রাতের অন্ধকারে এরকম কতজন সবেলালের গলাটা তারা ছিঁড়বে?' বলে কাকাবাবুর হাউ হাউ করে কান্না।

প্রথমবার নাগভূষণ জেল থেকে পালিয়েছেন। স্টেটসম্যানে নির্মলা কৃষ্ণমূর্তির একটা চিঠি বেরোল। কাকাবাবু বলেছিলেন, নিশ্চয়ই এর মধ্য দিয়ে নাগভূষণ আমাকে তাঁর খবর জানাতে চায়, নির্মলা তো লেখাপড়া জানে না, ইংরাজী তো দূরের কথা। কাকাবাবু বলেছিলেন, কিভাবে কৃষ্ণমূর্তি ওঁকে কাঁধে করে অন্ধ্রের পাহাড় অতিক্রম করেছিলেন। আমি কাকাবাবুকে বলেছিলাম, 'অত বড় হওয়া পোষাবে না আমার'। কাকাবাবু আমায় বললেন, 'দেখুন, নির্মলা তো লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু স্বামী মারা যাবার পর তাঁর আদর্শের জন্য তিনিও প্রাণ দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা মহৎ মানুষ থাকে। কোন সময় সেটা জেগে ওঠে বলা যায় না। আমাদের সমাজে আমাদের মানুষকে ছোট করে দেখতে শেখান হয়। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাই মানুষকে বড় করে। সমরেশ বসুর মধ্যে কতখানি অশ্রদ্ধা মানুষের প্রতি থাকলে বিবর, প্রজাপতি এসব লেখা যায়।' উনি বলতেন, 'এসব লেখা ওদেরই প্রয়োজন। মানবিক সম্পর্কের উপর ওরা আঘাত হানতে চায় এইভাবে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বড় হলেই বিপ্লব এগোবে। এগুলি প্রতিবিপ্লবী কাজের একটা অঙ্গ। অর্থাৎ কাকাবাবুর কাছ থেকেই শিখেছি যাঁরা দেশের মুক্তিরজন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সবসময় বড় করে দেখতে হবে। আর "মানবজাতির প্রতি প্রেম প্রীতি গভীর বিশ্বাস, / মানুষ না হলে লাভ নেই হয়ে জিনিয়াস"—কবির এই কথার অর্থ কাকাবাবুর কাছেই বুঝেছি।

দুটো ঘটনা বলি। একদিন বাড়িতে একটা হুলো বেড়াল ঢুকেছে। বাড়িটা পাইপের রেলিং দিয়ে ঘেরা এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের পাইপের জাল। বেড়ালটা ঢুকে আর বেরোতে পারছে না। আমরা হুটহাট করে বেড়ালটা তাড়াবার চেষ্টা করছি। বেড়ালটা বেরোল না তাতেও। ঘরের একটা কোনে যখন গেছে কাকাবাবু খপ করে ধরে বেড়ালটাকে বাইরে বার করে দিলেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ওঁর হাতটা কেটে গিয়েছিল। আরেকদিন ঘরে একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে গেছে। কাচের টুকরো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। কাকাবাবু খুঁতখুঁত করছেন, 'এখানে টুকরো আছে, ওখানে আছে। আপনারা

চটি পরে হাঁটুন। মামনকে একটা চটি পরিয়ে দিন।' এরপর উনি নিজে পায়ের চটিটা খুলে বললেন, 'পাইওনিয়ার হাঁটাটা আমিই হেঁটে দিই। সাবধান হওয়া ভাল, কিন্তু বেশি সাবধানী হওয়াটা ভাল নয়।'

আজিজুল হকের লেখায় পড়েছি গ্রেপ্তার হবার পর ৭২ সালে কাকাবাবুর জন্যই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের দুটো ঘর পাঁচিল তুলে পৃথক করা হয়। বারান্দাটা ঘন জাল দিয়ে ঘিরে সিঁড়ির মুখে জাল দেওয়া দরজা বসান হয় যাতে বাইরে থেকে কেউ না দেখতে পায়। হকের ভাষায় বলি, 'নীচে দাঁড়িয়ে একবার উপরের দিকে তাকালাম। একটা লোকের মুখ নিমেষে উঁকি মারল। এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ যেন বুকের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে—'কি বউ-বাচ্চার জন্য মন খারাপ করছে?'' হ্যা, এই তো সেই কণ্ঠস্বর, যিনি বলেছিলেন "বিপ্লবীরা যন্ত্র নয়, মানুষ, মানুষ বলেই তাঁরা হাসেন, মানুষের দুঃখে কাঁদেন। যে কাঁদতে জানে না সে বিপ্লবী নয়।"

একজন বিখ্যাত হার্ট সার্জেনের কথা বলছি। যাঁর নাম আমি করছি না। তিনি রাজনীতির ধারে পাশেও কোনদিন ছিলেন না। ১৯৭২ সালে তিনি পিজি হাসপাতালে যুক্ত ছিলেন। কাকাবাবু আর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সেই সুরক্ষিত সেলে যান নি। তাঁর আগে তিনি মর্গে চালান হয়ে গেছেন। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই দেখে ডাক্তারবাবু মর্গে ঢুকে পড়লেন। মনে মনে বললেন, 'একজন মহান মানুষ নীরবে মারা গেলেন, কেউ তাঁর জন্য ফুল মালা নিয়ে এলো না।' মর্গে ঢুকে দেখেন সম্পূর্ণ বডিটা ছিন্নভিন্ন। মুখ চোখ ফোলা। অত্যাচারের চিহ্ন সারা দেহে। কাকাবাবুর পায়ের দিকে তাঁর হাত নিজের অজান্তে চলে গেল। যারা বেঁচে আছি তাদের হয়ে তিনি যেন কাকাবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে নীরব মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, হৃদয়ের গভীর থেকে।